শেরশাবাদের কাগচ

১ম শরৎ সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭

শেরশাবাদের কাগচ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২০

বিশেষ লেখা:

- শেরশাবাদ ও শেরশাবাদিয়া জনজাতি: ঐতিহাসিক পরিচয়
- সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণ: ইসলামের দৃষ্টিকোণ
- কিসান ও শেরশাবাদিয়া: একই মায়ের দুই সন্তান
- আম-কেন্দ্রিক প্রবাদ: মালদহের জনজীবন

শেরশাবাদের কাগচ

(একটি গবেষণা এবং সৃজন ধর্মী পত্রিকা)

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

শরৎ (ভাদ্র-আশ্বিন) ১৪২৭: জিলহজ্জ ১৪৪১-মুহার্রাম ১৪৪২

(ই-সংস্করণ)

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ

১৪৫, পূর্ব হায়দারপুর (দাদামোড়),

ডাকঘর ও জেলা: মালদহ,

পিন: ৭৩২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

Shershabader Kagoch

A Literary and Research Journal of Shershabadia Vikash Parishad

Volume 1 Issue 1 August-September 2020

(Internet Edition)

For any quiry, please contact:

Cell/WhatsApp: 7001562168/ 9851755498 / 9002167429

Email: shershabaderkagoch@gmail.com

প্রচ্ছদ শিল্পী

মহ. মণিরুজ্জামন (মানিক)

টেকনিক্যাল ডিজাইনার

মহ. তসিকুল ইসলাম (রাসেল)

মুদ্রন

সোনালী প্রেস,

পূর্ব হায়দারপুর, ডাকঘর ও জেলা: মালদহ, পিন: ৭৩২১০১ পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক

ওয়ালিউল্লাহ

সেক্রেটারী, শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ

ভগবানপুর, ডাকঘর: সামসি, জেলা: মালদহ, পিন: ৭৩২১৩৯, পশ্চিমবঙ্গ

ই-সংস্করণের ভূমিকা

শেরশাবাদের কাগচ-এর মুদ্রিত ঐতিহাসিক সূচনা সংখ্যা (আগস্ট- সেপ্টেম্বর ২০২০) প্রকাশিত হয় ৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখ। একই সঙ্গে এটি ছিল ১৪২৭ বঙ্গাব্দের শরৎ তথা উৎসব সংখ্যা। সংখ্যাটি নিঃশেষিত হলে পাঠকের চাহিদা পুরণ করতে পুনর্মুদ্রণের দাবী উঠে। ভাবনা-চিন্তার পর সংখ্যাটি পরিমার্জিতরূপে ইন্টারনেট সংস্করণ রূপে পুনঃপ্রকাশিত ও পনর্মুদ্রিত হল। পত্রিকাটির ই-কপি শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদের সাইটে পাওয়া যাবে।

৩০ চৈত্র, ১৪২৭

ড. আবদুল অহাব

সম্পাদক, *শেরশাবাদের কাগচ*

সম্পাদকের কলমে

উদার নীল আকাশের রঙ মেখে সভ্যতার নদী বয়ে যায়। এই ‘নীল’ বিষ-রঙকেও হজম করে। উর্দ্ধাকাশে পৃথিবী ঘিরে ছাতার মতন যে ওজনস্তর রয়েছে তা ক্ষতিকর রশ্মিগুলোকে শুষে নিয়ে নীল হয়ে যায় ও পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করে। এই নীল ছায়া তাই এত প্রেমের। মেঘের রঙ ও ময়ূরের রঙ তাই নীল গোলাপের চেয়েও সুন্দর মনে হয়। শেরশাবাদ পরগণার মানুষ যারা নীলকণ্ঠ হতে পেরেছে, যারা আকাশকে ভালোবেসেছে, যারা এই অঞ্চলের গঙ্গা কোশী ফুলহর পাগলা মহানন্দা কালিন্দ্রী ভাগিরথী গুমানী ইত্যাদি নদীকে ভালোবেসেছে, যারা এখানকার বালুচরেও ঘাস উজ্জিয়ে নিরীহ পশুদের লালন-পালন করেছে, যারা জলা-জঙ্গলকেও সোনার ফসলে ভরিয়ে তুলে আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম করে রেখেছে শত শত বছর ধরে – সেইসব কৃষিজীবী শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায় সহ এতদাঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাহিত্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য এই “কাগচ”।

অবহেলিত এই সব জনজাতিগুলোর ভাষা ও সাহিত্যে জোয়ার আসুক, ছুটে চলুক শুভ সংস্কৃতির নৌকাগুলো, সাদা “কাগচ” ভরে উঠুক নীল কালো সোনালি বর্ণে। সারা দিন খেটে খাওয়া এই মানুষগুলো রাতকেই বেছে নেয় স্বপ্ন-কবিতায় মন-কাঁথাকে রঙিন সুতোর নক্সাতে ভরিয়ে তুলতে। তাই রাতের কালো রঙেও এতো আলো জ্বলে, প্রেম জাগে। এই সব জিনিষ “শেরশাবাদের কাগচ”-এর প্রচ্ছদে ধরা পড়েছে। প্রচ্ছদ শিল্পীদের জানাই ধন্যবাদ।

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদের এটি বিশেষ উদ্যোগ। বিহারে ১৯৮০ সালে “অল বিহার শেরশাহবাদী এসোসিয়েসন” তৈরী হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে ছোটো ছোটো পরিসরে কয়েকটি শেরশাবাদিয়া সংগঠন তৈরী হলেও কাজের কাজ পরিলক্ষিত হয়নি। তাই মালদহ শহরের কোবরা ক্লাবের ভবনে ৪ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে মিটিং-এর মাধ্যমে এই পরিষদ গঠিত হয়েছে। এটি একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। শেরশাবাদিয়া জনজাতিসহ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া পড়শী জনজাতিগুলোকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এটি তৈরী। এই কাগচের মতো আরো কাগচের জন্ম নিক ও প্রত্যেকটি জনজাতির নিজস্ব পত্রিকা নিয়মিত বেরোক – এই কামনা করে পরিষদ।

পরস্পরের সহযোগিতায় একসুত্রে বাঁধা একটি বৃহত্তর উদার সমাজ গড়ে উঠুক – এই ধারণার ফলন হলো এই কাগচের লেখাগুলো। ধন্যবাদ জানাই আমাদের কবিতা-সাহিত্যের কৃষকদের যাঁরা এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ধন্যবাদ গৌড়বঙ্গ সাহিত্য সমিতিকে যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এই পত্রিকার বীজপত্র গজাতে সাহায্য করেছে। আমরা কৃতজ্ঞ এই পত্রিকার

পরামর্শদাতাদের কাছে যাঁরা অভিভাবকের মতন সংস্কৃতি-নদীর জলে সাঁতার শেখাতে চোখের সামনে রেখেছেন আমাদের মতন সাহিত্য-প্রেমীদের।

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদের ফেসবুক গ্রূপের সকল সদস্য, লেখক এবং পাঠকদের অনুপ্রেরণা হলো এই উদ্যোগের রসদ। আমরা তাঁদের কাছে ঋণী।

করোনা ভাইরাস সন্ত্রাসী হয়ে বিশ্ব জুড়ে যে দাপট চালিয়েছে তাতে আমাদের বহু প্রিয়জনকে হারিয়েছি। কাগচের প্রথম তথা শরৎ সংখ্যাটি তাঁদেরকে উৎসর্গ করলাম।

কোরোনার কাছে আমরা হার মানিনি। মহামারীর এই প্রাদূর্ভাবে উদ্ভূত শারীরিক ও সামাজিক দূরত্বের এই দীর্ঘ মাসগুলোতে আমরা সোস্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আরো বেশি একাত্ম হয়ে উঠেছিলাম। হয় তো এই পত্রিকা এই সঙ্কট-কণ্টকে ফোটা একটা গোলাপের মতো।

কোরোনা এক আশমানী বালা-মসিবৎ। কোরোনা আমাদের অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে, অনেক কিছু ক্ষতি করেছে। তবুও কোরোনা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিল। আশমানী বালা যিনি পাঠিয়েছেন, যিনি এই সন্ত্রাসী বালার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামী ও সংযমী করে তুলেছেন তাঁর সমীপেই আমাদের সিজদা, আমাদের প্রণতি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি লেখকদের নিজস্ব।
এ জন্য সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যুক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ দায়ী নয়।

-- সম্পাদক

উৎসর্গ

কোভিড-১৯ অসুখে নিহত হওয়া সব মানুষের গোনে হামারঘে মন দুখে কাতর। এই কোভিড-কঠিন অক্তে মেলাই গুণী মানুষকে হারিয়্যাছি হামরা। অঁরঘে সভারই প্রতীক-স্বরূপ ভারত-বিবেক কবি মরহুম রাহাত ইন্দোরীর গোনে হামারঘে শ্রদ্ধাঞ্জলি:
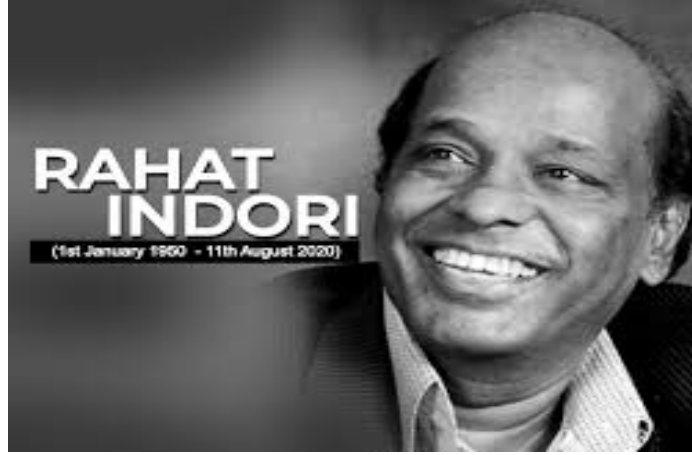
বিশেষ নিবন্ধ

শেরশাবাদ স্থানাঞ্চল এবং শেরশাবাদিয়া ভাষা ও জনজাতির ইতিাস নির্মাণ

ড. আব্দুল অহাব

আলোচিত বিষয়-সমূহ:

'শেরশাবাদিয়া' জনজাতি মূলত্ব বাঙলা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী। বাঙলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের মিলন-মোহনায় একদা যে 'শেরশাবাদ' নমক আর্থ-ভৌগলিক স্থানাঞ্চল গড়ে উঠে, সেই ভুখণ্ডের ভূমিপুত্রগণ এবং তাদের প্রজন্মরাই শেরশাবাদিয়া তথা শেরশাবাদী। গঙ্গা-মহানন্দার দোয়াব অঞ্চল (গৌড়-অঞ্চল), গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম সংলগ্ন এলাকা (রাঢ় অঞ্চলের উত্তরাংশ) এবং মহানন্দার পূর্বে স্থিত বরিন্দ বা বরেন্দ্র অঞ্চলের দক্ষিণাংশ – এই বিস্তীর্ণ নদী-মাতৃক, উর্বর

মৃত্তিকাযুক্ত এবং সুসাস্থ্যকর প্রকৃতিযুক্ত ভুখণ্ডই হলো শেরশাবাদ স্থানাঞ্চল। এই ভৌগলিক অঞ্চলের বিশেষ কথ্য বাংলা ভাষার নামও শেরশাবাদিয়া। এখানে জনসংখ্যার নিরিখে এই ভাষায় কথা-বলা মুসলিম কৃষক শ্রেণীর বসবাস সব চেয়ে বেশি, তাই এদের জনজাতিগত বিশেষ পরিচয় হল শেরশাবাদিয়া। জনবিস্তারের স্বাভাবিক নিয়মে এদের একাংশ স্থানান্তরিত হয়ে পার্শবর্তী জেলাসমূহের তথা রাজ্যসমূহের স্থায়ী নিবাসী। এমন কি নেপাল ও ভূটানেও শেরশাবাদিয়া গ্রাম রয়েছে বলে জানা যায়। কোনো কোনো জায়গায় এদের ভুলভাবে বাদিয়া তথা ভাটিয়াও বলা হয় যদিও বাদিয়া ও ভাটিয়া হলো অন্য কয়টি জানজাতির নাম। এই নিবন্ধে ইতিহাস ও সরকারি তথ্যের আলোকে এই বিষয়গুলো আলোচনা করবো।

১. গৌড়াঞ্চলের বাংলা ভাষার মতই পুরণো জনজাতি শেরশাবাদিয়া

শেরশাবাদ স্থানাঞ্চলের এই ভাষাভাষী কৃষক সম্প্রদায় বাঙালি জাতির মতই একটি মিশ্র জনজাতি। মুসলিম শেরশাবাদিয়াগণের সিংহভাগের পূর্বপুরুষগণ এদেশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ছিলেন ব'লে অনুমেয়। মধ্যযুগে বহিরাগত ধর্মপ্রচারক ও বণিকগণের একটা ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে। আবার এদের একাংশের পূর্বপুরুষগণ গৌড়-পাণ্ডয়ার বিভিন্ন আমলের শাসককুল, তাদের আমলা ও সৈন্যসামন্তগণ যারা অবসর নেওয়ার পর বা চাকরি হারানোর পর চাষাবাদকে বেছে নিয়েছিল পেশা হিসেবে। এই সব ইঙ্গিত পেশ করেছেন ব্রিটিশ লেখকদের কেউ কেউ। এমন কি মোগল এবং নবাবী আমলেও এমন বহু সৈন্য চাষাবাদকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল নিজেদের পেশা হিসেবে, সেই ইতিহাসও আমরা পাই।

রাঢ় এবং বরেন্দ্র – এই দুই ভৌগলিক অঞ্চলের যুক্তাঞ্চলে যেহেতু শেরশাবাদ পরগণা, সেইহেতু শেরশাবাদিয়া ভাষা রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী আঞ্চলিক ভাষাদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। মধ্যযূগের বাংলার রাজধানী গৌড় যেহেতু এই এলাকার কেন্দ্রে রয়েছে, সেইহেতু এই ভাষাটি মধ্য যুগে স্বীকৃত গৌড়ীয় বাংলা ভাষার মর্যাদা পেয়েছিল ব'লে অনুমান করা যায়, যদিও পরবর্তীতে বাংলার রাজধানী মুঘল যুগে ঢাকায় এবং ব্রিটিশ আমলে কোলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের উপভাষা স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার মর্যাদা পায় আর গৌড়াঞ্চলের ভাষা উপেক্ষিত হয়ে পড়ে।

এই এলাকার নাম যে 'সরসাবাদ/সেরসাবাদ' সেটা মুঘল-সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী আবুল ফযলের লেখা *আইন-ঈ-আকবারী* গ্রন্থে দেখতে পাই। কিন্তু, তারও আগে হতে চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে পাল, সেন, তুর্কী, আফগান, মোগল, ব্রিটীশ যুগ পর্যন্ত এই ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং কৃষক জনগৌষ্ঠী প্রভাবিত

হয়েছে, যেমন বারবার বন্যাজলে বাহিত পলিমাটি দিয়ে একটি ভুখণ্ড প্রভাবিত হয়ে থাকে।

ঠিক একই ভাবে, 'সরসাবাদ'/ 'সেরসাবাদ' / 'শেরশাবাদ' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন 'সরসাবাদিয়া'/ 'সেরসাবাদিয়া'/ 'সিরসাবাদিয়া' / 'শেরশাবাদিয়া' নামগুলো ১৮৫০ সালের আগে লিখিত কোনো ইতিহাসে বা রেকর্ডে পাওয়া না গেলেও অর্থাৎ এই জনজাতির নাম-পরিচয়টি বর্তমানে কমবেশি দেড়শো বছরের বেশি পুরণো না হলেও গৌড়বঙ্গের উক্ত ভাষার মতই সম্প্রদায়টি এই ভৌগলিক অঞ্চলেরই মুলনিবাসী একটি পুরণো জনগোষ্ঠী।

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমরা ঐতিহাসিক সূত্র ধরে দেখে নেব 'শেরশাবাদ' এবং 'শেরশাবাদিয়া' নামের ব্যুৎপত্তি এবং এই জনজাতির বিস্তার।

২.১. 'শেরশাবাদ' পরগণানা হতে 'শেরশাবাদিয়া': ল্যাম্বরণ ও কার্টারের তথ্য

শেরশাবাদিয়া তথা শেরশাবাদী শব্দদুটি শেরশাবাদ পরগণানার নাম থেকে এসেছে তা ব্রিটিশ আমলের দুটি সরকারী রেকর্ড তথা আকর গ্রন্থের প্রেক্ষিতে আলোচনা করবো। প্রথমটি হলো ভারত সরকারের অফিসার জি. ই. ল্যাম্বরণ্ কর্তৃক রচিত এবং দ্য বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো হতে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার: মালদা* গ্রন্থ। ল্যাম্বরণ উল্লেখ করেছেন যে ১৮৫৯ সালে মালদা পূর্ণ জেলা রূপে গঠিত হওয়ার পর গঙ্গা নদী পার হয়ে সাঁওতাল পরগণা (বর্তমানে সাহেবগঞ্জ ও দুমকা) থেকে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া জনজাতি এই জেলার বরিন্দ এলাকায় (যেমন গাজোল, হবিবপুর ও পুরাতন মালদায়) এসে ঘন জঙ্গল সাফ ক'রে চাষবাস করতে শুরু করে (পৃষ্ঠা ২৪)। পরবর্তীতে, বিশেষ করে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) পর এবং ১৯০৯ সালে গোদাগাড়ী-সিঙ্গাবাদ-কাটিহার রেললাইন চালু হলে শেরশাবাদ পরগণা থেকে শেরশাবাদিয়াগণ জেলার টাল ও ডুবা এলাকায় আগমন করে ও চাষাবাস করতে থাকে (পৃ. ২৪, ৩৬, ৬৮)। এই প্রেক্ষাপটে ল্যাম্বরণ্ স্পষ্ট করে বলেছেন যে শেরশাবাদী (শেরশাবাদিয়া) নামটি শেরশাবাদ পরগণার নাম থেকেই এসেছে:

> Lately there has been a movement of immigration on the part of the Shershabadi Mahomedans, so called from the paragana of Shershabad where they are found in large numbers, into the *duba* and *tal* lands of the district: this movement has been facilitated by the construction of railway (পৃষ্ঠা ২৪)।

বলা বাহুল্য যে, টাল ও ডুবা এলাকাযুক্ত উত্তর মালদা ব্রিটিশ যুগের আয়তন যুক্ত শেরশাবাদ পরগণার সীমানার বাইরে ছিল, কিন্তু মুঘল আমলে "জাওয়ার-ই-শেরশাবাদ" বা শেরশাবাদ সার্কেলের এর মধ্যে ছিলো।

এবার এম. ও. কার্টার রচিত ও আলিপুর (কোলকাতা) হতে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে এণ্ড সেট্‌লমেন্ট অপারেশনস ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব মালদা ১৯২৮-১৯৩৫* গ্রন্থ থেকে দেখাবো, মুর্শিদাবাদে স্থিত শেরশাবাদ পরগণার অংশ হতে গঙ্গার ভাঙনের ফলে শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর অনেকে মালদা জেলায় আসতে বাধ্য হয়েছিল (পৃ. ৪৫) । মালদহের মুসলিমদের আলোচনা প্রসঙ্গে শেরশাবাদিয়া জনজাতিকে প্রথম স্থানে রেখে এম. ও. কার্টার উল্লেখ করেন যে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এরাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য (পৃ. ৪৫) । তাদের শেরশাবাদিয়া পরিচয়টা শেরশাবাদ পরগণার নামেই হয়েছে, এটা তিনি জোর দিয়ে বিশেষভাবে লিখেছেন:

> The name [Shersabadiya] is derived from Shersabad Pargana of Murshidabad district, from which they were forced to emigrate owing to the erosion of the Ganges (পৃষ্ঠা ৪৫) ।

২. ১. 'শেরশাবাদ' স্থানাঞ্চল হতে 'শেরশাবাদিয়া': আবদুস সামাদের অভিমত

উপরের আলোচনায় দেখেছি, শেরশাবাদ পরগণার নাম থেকে যথাক্রমে শেরশাবাদী ও শেরশাবাদিয়া শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে -- এই তথ্যটি দিয়েছেন তৎকালীন মালদহে নিযুক্ত দুই ব্রিটিশ অফিসার যথাক্রমে ল্যাম্বরন (১৯১৮) ও কার্টার (১৯৩৮)। কিন্তু অধুনাকালে শেরশাবাদিয়া সমাজ-সংস্কৃতির প্রথম গবেষক এবং *শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য* (১ম প্রকাশ ১৯৮৭) গ্রন্থের লেখক আবদুস সামাদ শেরশাবাদিয়া নামের উৎস হিসেবে শেরশাবাদ পরগণাকে নয় বরং শেরশাবাদ নামক নির্দিষ্ট এক জনপদকে বেছে নিয়েছেন। সেটি হলো তাঁর নির্ণায়াবিষ্কৃত প্রাক-স্বাধীনতাকালীন অবিভক্ত মালদহের তথা অধুনা বাংলাদেশের শিবগঞ্জ থানার মনাকষা এলাকাভুক্ত শেরশাবাদ স্থানাঞ্চলটি (আবদুস সামাদ, *জেলা মালদহের ইতিহাস ও মালদহ সমগ্র*, কোলকাতা: বিশ্বজ্ঞান, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৬৬)। তাঁর অভিমত হলো, এই স্থানাঞ্চলের নাম থেকেই শেরশাবাদী তথা শেরশাবাদিয়া শব্দদ্বয় নিষ্পন্ন হয়েছে। আবদুস সামাদ এই ব্যাখাটিই করেছেন যে 'শেরশাবাদ' স্থাননামে যথাক্রমে 'ঈ' এবং 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'শেরশাবাদী' এবং 'শেরশাবাদিয়া' শব্দদুটি নিষ্পন্ন হয়েছে (*শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য*, ৩য় সংস্করণ, মালদহ: বাদিয়া-বার্তা প্রকাশনা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৫, ১৮-১৯; এবং তাঁরই *বাংলার মুসলিম জনজাতি*, ৩য় সংস্করণ, কোলকাতা: বাকচর্চা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৪)।

২. ২. 'জওয়ার-ই-শেরশাবাদ' (Circle of Sersabad) হতে 'শেরশাবাদিয়া'?

প্রথমে ক্ষুদ্র জনপদ ছিল শেরশাবাদ যা আব্দুস সামাদ মনে করেন। সুরী ও কররানী শাসকদের সময় (১৪৩৮-১৪৭৬) একটা বৃহদাঞ্চল জুড়ে এই নামে পরগণা ছিল যা শেরশাহ তৈরি করেছিলেন। মুঘল যুগে আকবরের সময় থেকে শেরশাবাদ যেমন একটি 'মহল' ছিল; তেমনই এর সঙ্গে আরো নয়টি মহল যুক্ত

করে শেরশাবাদ নাম দিয়ে একটি বৃহৎ মণ্ডল বা সার্কেল করা হয়েছিল যাকে "জাওয়ার-ই-শেরশাবাদ" বলা হয়েছে। "জাওয়ার" শব্দের অনুবাদ কেউ কেউ "environs" (পরিমণ্ডল) বা "adjacent villages" (পার্শবর্তী গ্রামসমূহ) করলেও সঠিক কারণেই এটাকে "সার্কেল/circle" (প্রখণ্ড) বলেছেন জন বীমস। প্রকৃত পক্ষে, এখানে মহল মানে একটি গ্রাম নয়, বরং আরো বড় এলাকাঞ্চলকে বুঝায়। আইনী আকবরীতে ফারসী হরফে লেখা সেরসাবাদ (Sersabad) /সরসাবাদ (Sarsabad) হলো আলচ্য শেরশাবাদ স্থান-নামটি। সুতরাং, "জওয়ার-ই-সেরসাবাদ" (Circle of Sersabad) নামের বড় ভুখণ্ডটি ছিল মুঘল যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ সার্কেল। নবাবী আমলে পরিবর্তিত সীমানায় আবার শেরশাবাদ পরগণা তৈরী হয় যা ইংরেজদের সময় কমবেশি জারি ছিল। মুঘল যুগের শেরশাবাদ সার্কেলের এই দশটি মহল হলো: আকবরপুর, পারদিয়ার, খিযরপুর, সেরসাবাদ, কোতওয়ালী, গৌড়হণ্ড, গারহী (গাঢ়ী), মাকরাইন, মানিকপুর ও হাতান্দা (২টি মহল) [*Ain-i-Akbari of Abul Fazl*, Vol. II, Trans. H. S. Jarret and Annot. Jadunath Sarkar, Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1949, পৃষ্ঠা ১৪৪]। ১৮৯৬ সালের দিকে জন বীমসের স্থান নির্ণয়ানুসারে সেরসাবাদ সার্কেলের দশটি মহলের বর্ণনা এইরূপ: ১. আকবারপুর/একবরপুর উত্তর-পশ্চিম মালদহে অবস্থিত; ২. পারদিয়ার মালদহের সর্বশেষ দক্ষিণে অবস্থিত যা পরবর্তীতে শেরশাবাদে লীন হয়ে যায়; ৩. খিযিরপুর যা পরবর্তীতে খিদিরপুর নামে পরিচিত ও তৎকালীন কালিন্দ্রী নদীর নিকট (ভালুকার কাছাকাছি) তথা হায়াতপুর শহরের উত্তরে অবস্থিত এবং একবরপুরে লীন হয়ে যায়; ৪. সেরসাবাদ যা বর্তমানে শেরশাবাদ পরগণা এবং এর অন্তর্ভূক্ত মালদহের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম তথা গৌড় এবং ইংরেজবাজার; ৫. কোতওয়ালী হায়াতপুরের নিকট বর্তমানে একবরপুরের অন্তর্ভুক্ত; ৬. গৌড়হণ্ড হলো উত্তর-পশ্চিম মালদহে একটি পরগণা; ৭. গারহী গঙ্গার দক্ষিণে সাঁওতাল পরগণায় (এখন সাহেবগঞ্জে) অবস্থিত; ৮. মাকরাইন উত্তর-পশ্চিম মালদায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পরগণা তথা একবরপুর সংলগ্ন, ৯-১০. মানিকপুর ও হাতিন্দা মিলে উত্তর মালদহের হাতিন্দা পরগণাটি তৈরি হয়েছে (John Beams, "Notes on Akbar's Subahs," *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland*, London: 1986, পৃষ্ঠা ১১৪)।

২. ৩. শেরশাবাদ স্থানাঞ্চল, পরগণা, সার্কেল: শেরশাবাদিয়া নাম-উৎসের সমন্বয়

শেরশাবাদিয়া নামের উৎস হিসাবে শেরশাবাদ নামের স্থানাঞ্চল, পরগণা এবং সার্কেল বিষয়ে আমার একান্তই নিজস্ব অভিমত রইলো এখানে। একটি ক্ষুদ্র স্থানাঞ্চল বিশেষ কারণে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিকভাবে যখন গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায় এবং ঐ স্থানাঞ্চলটির নামটি দ্বারা যখন নতুনভাবে এক বৃহৎ ভৌগলিক অঞ্চলকে বোঝায়, তখন একটা নতুন বৃহৎ প্রক্ষাপট তৈরি হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ১৮১৩ সালের আগে পর্যন্ত মালদহ ছিল দিনাজপুরের একটি থানার নাম তথা একটি ছোট শহরের নাম যা এখন পুরাতন (ওল্ড) মালদহ রূপে পরিচত। কিন্তু, মহানন্দা নদীর পশ্চিমের সমগ্র ভুখণ্ড পূর্ণিয়া জেলা থেকে বিছিন্ন করে এবং দিনাজপুরের গাজল ও মালদহ থানা সহ মালদহ নামে একটি নতুন জেলা তৈরি হলে মালদহ নামটির মধ্যে নতুন ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য যুক্ত হয়। এখন মালদাহী বা মালদহিয়া বা মালদাইয়া বলতে শুধু মাত্র ওল্ড মালদহ শহরের বা থানার মানুষ বা তার ভাষা-সংস্কৃতিকে বোঝায় না; বরং মালদাইয়া শব্দটি দিয়ে সমগ্র মালদহ জেলার মানুষের সব থেকে প্রভাবশালী বিশেষ (typical) সংস্কৃতি তথা ভাষাবিশেষকে বোঝায় যার সঙ্গে শেরশাবাদিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিশেষ যোগ রয়েছে। আর একটি উদাহরণ হল কলিকাতা/কোলকাতা/কলকাত্তা ছিল একটি গ্রাম যা ব্রিটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক সময় কিনেছিল। কিন্তু তার পার্শবর্তী গ্রামগুলো সহ সেখানে যখন ব্রিটিশদের হাতে একটা নগরে গড়ে উঠলো এবং তা বাংলা ও ভারতের রাজধানীতে পরিণত হলো, তখন কোলকাতা নামটি দিয়ে শুধু একটি গ্রামকে বোঝায়না। বরং নামটির মধ্যে বিভিন্ন তাৎপর্য যুক্ত হলো এবং তা দিয়ে এক বৃহৎ ভৌগলিক আয়তনযুক্ত অঞ্চলকে বোঝাতে শুরু করলো। দ্বিতীয় তথা বৃহৎ অর্থেই কলকাত্তা হতে নিষ্পন্ন হয়েছে হিন্দী কলকত্তিয়া শব্দার্থটি।

একটি জনজাতি গঠনের জন্য একটি বৃহৎ এলাকার দরকার হয়, তার জন্য একটি গ্রাম যথেষ্ট নয়। তাই একটি গ্রাম বা মহল হিসেবে শেরশাবাদ যথেষ্ট নয় -- বরং এর জন্য আরো বড় এলাকাযুক্ত শেরশাবাদ পরগণা তথা সার্কেলের ধারণাটি চলে আসে। সেই দিক বিবেচনা করলে শেরশাবাদী/শেরশাবাদিয়া জনজাতি পরিচয়টি পরগণা তথা সার্কেলের নামে হয়েছে। এই যুক্তিতে ল্যাম্বরণ ও কার্টারের তথ্যটি সঠিক প্রতীয়মান হয়। আবার, মূল স্থান শেরশাবাদ নাম-শব্দে '-ঈ' এবং '-ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে শেরশাবাদী ও শেরশাবাদিয়া শব্দটি – আবদুস সামাদের এই অভিমতটিও ভীষণভাবে সঠিক। এইভাবে দুটি মতের সমন্বয় সাধন আমরা সহজেই করতে পারি।

প্রসঙ্গত এখানে একান্তই উল্লেখযোগ্য যে, এ জনগোষ্ঠীর ঐ 'শেরশাবাদিয়া' ও 'শেরশাবাদী' নাম দুটির মধ্যে এ যাবৎ অপেক্ষাকৃত বেশী বা সর্বসাধারণ্যে বহুলভাবে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য এবং একচ্ছত্রভাবে লোকমুখে উচ্চারিত ও সর্বজনবিদিত শুধু *ঐ* প্রথমোক্ত 'শেরশাবাদিয়া' নামটিকেই যথার্থতই বেছে নিয়েছেন আব্দুস সামাদ তাঁর সব লেখায়।

৩. সম্রাট শেরশাহের নামেই কি পরগণার নাম 'শেরশাবাদ' ?

পূর্বোল্লিখিত এবং জি. ই. ল্যাম্বরণ কর্তৃক রচিত *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার: মালদা* গ্রন্থে সুস্পষ্ট লেখা আছে যে সম্রাট শেরশাহ ভুমি-রাজস্বের

সুবিধার্থে তাঁর রাজ্যগুলোকে পরগণায় ভাগ করেছিলেন এবং বঙ্গপ্রদেশে যে পরগণায় গৌড় রয়েছে সেই পরগণার নাম হলো 'শেরশাবাদ':

> **In the re-organisation of the provinces, Sher Shah introduced the fiscal division of the pargana into Bengal: that in which Gaur lies bears the name Shershabad (পৃষ্ঠা ২০)।**

কিন্তু, শেরশাহের নামেই এই পরগণার নাম হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে ল্যাম্বরণ কিছুই বলেন নি। এ ব্যাপারে এম. ও. কার্টারও ঐতিহাসিকভাবে নিশ্চিৎ নন: "It is said that this pargana was named after the Emperor Sher Shah" অর্থাৎ, কথিত আছে যে শেরশাহের নামে এই পরগণার নাম হয়েছে (পৃষ্ঠা ৬৫) ।

শেরশাহের নামের সঙ্গে শেরশাবাদের নামের সম্পর্কের অনিশ্চয়তার একটা কারণ এটা হতে পারে যে, আবুল ফজলের মুল ফার্সী গ্রন্থ *আইন-ই-আকবারীতে* 'সেরসাবাদ' বানানে 'শ'-এর জায়গায় 'স' রয়েছে, 'এ-কার' স্পষ্ট নেই এবং 'হা' নেই: سرسأباد [[*The Ain-i-Akbari*, Abul-Fazl-i-'Allami, Original Persian, Vol.-I (Part-II), Calcutta, 1872, পৃষ্ঠা ৩৯৬]। উক্ত ফার্সী বানান অনুসরণ করে এই গ্রন্থের প্রথম ইংরেজী অনুবাদক ফ্রান্সিস গ্লাডউইন (Francis Gladwin)-এর অনুবাদ *Ayeen Akbery or the Institutes of the Emperor Akbar* (London 1800)-এর ২য় খণ্ডে শেরশাবাদের ইংরেজী বানান রয়েছে Sersabad (পৃষ্ঠা ১৯৩)। পক্ষান্তরে কর্ণেল এচ. এস. জারেট (H. S. Jarret)-এর অনুবাদ *The Ain I Akbari* (Vol.-2, Calcutta: 1891)-এর মধ্যে শেরশাবাদের ইংরেজী বানান রয়েছে Sarsabad বা সরসাবাদ (পৃষ্ঠা ১৩১) । বলা বাহুল্য যে শেরশাবাদিয়াদের কোথাও কোথাও সরসাবাদিয়া বলা হয় (আবদুস সামাদ, "শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য", পৃষ্ঠা ১৬) এবং Sarsabad বা সরসাবাদের সঙ্গে এর একটা যোগ আছে বলে মনে হয়।

'শেরশাবাদ' নামের ব্যাপারে জন বীমস (John Beams)-এর একটা লেখার সমালোচনা এখানে জরুরী। তাঁর "Notes on Akbar's Subahs, with reference to the *Ain-i-Akbari* [No. I: Bengal]" একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ যার মধ্য তিনি *আইনী-আকবারী*-র বর্ণনা অনুযায়ী "সুবাহ-বাঙ্গাল" এর ১৯টি সরকারের অধীন বিভিন্ন 'জাওয়ার' (Circle) ও 'মহলে'র ভৌগলিক অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। জন বীমসের এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* (London:1896)-এর ৮৩-১৩৬ পৃষ্ঠায়। গৌড়কে কেন্দ্র করে যে জান্নাতাবাদ (লক্ষ্ণৌতি) সরকারের আলোচনা রয়েছে *আইনী আকবারী*-তে তারই অন্তর্গত ছিল শেরশাবাদ (Circle of Sarsabad)-এর দশটি মহল বা ক্ষুদ্রভাগ যার আলোচনা আগে করা হয়েছে। নবাবী আমলে ১৭২২ সালে নবাব জাফর খান মুঘল যুগের সুবাহ-ই-বাঙলার ১৯টি সরকার ভেঙে ১৩টি চাকলা বা বিভাগ তৈরি করেন এবং মহলগুলো ভেঙে বা যুক্ত করে পরিবর্তিত সীমায়তন-

যুক্ত পরগণা তৈরী করেন (Jhon Beams পৃষ্ঠা ৮৭)। নবাবী আমল থেকে ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত পরগণাগুলোর সীমা-আয়তনের পরিবর্তনের উপর জন বীমসের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য:

> **This was the beginning of a series of changes, which lasted for another fifty years, till the country came under British rule. Successive Nawabs tampered with the revenues, as well as with the boundaries of all the political divisions, in order to defraud the Imperial Government and fill their own pockets. They imposed numerous abwabs, or illegal cesses and exactions, and they created the immense Zamindaris or estates, which are so striking a feature in the Bengal of to-day. (Jhon Beams পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮)।**

নবাবী আমলে (১৭২২-১৭৯৩) 'শেরশাবাদ' নামের পাশাপাশি 'শেরশাহাবাদ' (Shershahabad) নামটি চালু হয়ে যায় -- অর্থাৎ পরগণাটির নামকে শেরশাহের নামের সঙ্গে যুক্ত করাা হয়। ব্রিটিশ সরকারের আমলারাও সেটাই অনুসরণ করেছেন। যেমন W. W. Hunter তাঁর A *Statistical Account of Bengal* (7th Vol.) (১৮৭৬) গ্রন্থে পরগণাটির নাম 'শেরশাহাবাদ' উল্লেখ করছেন। পক্ষান্তরে, তার আগে বিভিন্ন আদালতের কোর্টের প্রসিডিংসে ওহাবী আন্দোলনের আসামীদের অনেকের ঠিকানা 'শেরশাবাদ' (পরগণা) লেখা আছে [*Selections from Bengal Government Records On Wahhabi Trials* (1863-1870), পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৬৬] । পূর্বোল্লিখিত জি. ই. ল্যাম্বর্ণের মালদা গেজেটীয়ার (১৯১৮) এবং এম. ও. কার্টারের মালদা জেলার "সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট" রিপোর্টে (১৯৩৮) 'শেরশাবাদ' লিখা আছে।

'শেরশাবাদ' কথাটি শেরশাহের নামের সঙ্গে যুক্ত এবং 'শেরশাহাবাদ' শব্দের লোকমুখে বিকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ – এমনই মনে করছেন জন বীমস তাঁর "Notes on Akbar's Subahs, with reference to the *Ain-i-Akbari* [No. I: Bengal]" লেখায়, যদিও তাঁর এ যুক্তির সমর্থনে কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করেন নি তিনি। জন বীমস একটা অনুমান-নির্ভর গল্প তৈরি করেছেন। যেহেতু শেরশাহ অন্যায়ভাবে দিল্লীর সিংহাসন দখল করে সম্রাট হুমায়ুনকে সাম্রাজ্যচ্যুত করেছিলেন, সেইহেতু শেরশাহের 'শাহ' বা সম্রাট টাইটেল অস্বীকার করে তাঁর নাম শের খান উল্লেখ করতেন মুঘল দরবারের লেখকগণ। এই যুক্তিকে সামনে রেখে জন বীমস মনে করেন যে সম্রাট আকবরের যাতে অসম্মান না হয় সেই জন্য তাঁর রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল 'শেরশাহাবাদ'-এর লোকমুখে বিকৃত (popular corruption) এবং অর্থহীন নাম 'Sarsabad' শব্দকে রেখে দিয়েছেন মহল বা পরগণার নাম হিসাবে। এই গল্পটা যে জন বীমসের কল্পনাপ্রসুত একটি অনুমান তা স্বীকার করে তিনি বলেন: "This is merely a conjecture, but, I think, a probable one" (পৃ. ১১৩)।

শেরশাহের 'শাহ' টাইটেলের বিরোধিতা করার জন্য যদি 'শেরশাহাবাদ' লিখতে অসুবিধা হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠে, গৌড় থেকে কিছু দূরে অবস্থিত 'টাঁড়া সরকার'-এর অধীন 'শেরশাহী' নামক মহল/পরগণার নামটা কেন অটুট থেকে গেলো *আইনী আকবারী*-তে, তা জন বীমসের মাথায় আসে নি, অথচ তিনি শেরশাহীর ভৌগলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন (প্রাগুক্ত পৃ. ৯৫) । আর, 'শাহ' (সম্রাট) টাইটেল-যুক্ত শেরশাহের নাম আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারা যায় 'শেরশাহী' স্থান নামে। এখান থেকেই প্রমাণিত হয় যে জন বীমসের যুক্তিটি একেবারেই ছেঁদো। এছাড়া *আইনী আকবারী*-তে বর্ণিত বিভিন্ন সরকারের অন্তত ৮টি মহল/পরগণার নাম 'শেরপুর', ৩টির নাম 'শেরগড়' এবং ১টির নাম 'শেরকোট' যেখানে 'শের' বানানটি খাঁটি শুদ্ধভাবে ফারসীতে লেখা আছে যেগুলোর বানান পরিবর্তন টোডরমল করেন নি কেন -- সেটারও আলোচনা করেন নি জন বীমস। আর একটা যুক্তি হল, সরসাবাদ (Sarsabad) শব্দ-নামে স্থানাঞ্চল অন্যত্র এখনো আছে, যেমন সরসাবাদ (বহরমপুর ব্লক, মুর্শিদাবাদ) এবং ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার কাঠিকুণ্ড ব্লকের সরসাবাদ গ্রাম তথা জমা ব্লকের সরসাবাদ গ্রাম-পঞ্চায়েত।

শেরশাবাদের (Sersabad/Sarsabad) আগের নাম যদি 'শেরশাহাবাদ' হয়, তার প্রমাণস্বরূপ আফগান আমলের কোনো তথ্যসূত্র বা মুঘল আমলের কোনো তথ্যসূত্রের ভীষণ দরকার। মৌজুদ অবস্থায় বরং 'শেরশাবাদ' নামটির পরিবর্তে 'শেরশাহাবাদ' নামটি বাঙলার নবাবী আমল তথা ঈস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির শাসনামলে বিভিন্ন নথিতে প্রবেশ করেছে, এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যেটুকু অকাট্য তথ্য পাওয়া গেছে, সেটা হলো জাওয়ার/মহল/পরগণার নাম 'শেরশাবাদ' ওরফে 'সেরসাবাদ/সরসাবাদ' সব চেয়ে পুরণো এবং সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। সেই রকমই জনজাতির নাম হিসেবে শেরশাবাদিয়া শব্দটাও বেশি ইতিহাস-স্বীকৃত, ঐতিহ্যময় এবং জনপ্রিয়।

শেরশাবাদ স্থান-নামে শেরশাহের নামের সম্বন্ধ ধরে নিয়ে লেখক আবদুস সামাদ তাঁর *বাংলার মুসলিম জনজাতি* (৩য় সংস্করণ, কোলকাতা: বাকচর্চা, ২০০৯) গ্রন্থে ব্যাখা করেছেন যে শেরশাহের নামে ফার্সী স্থান-নাম সূচক শব্দ 'আবাদ' যুক্ত হয়ে 'শেরশাহাবাদ' বা 'শেরশাবাদ' স্থাননামটি তৈরি হয়েছে। এইভাবে তিনি দেখিয়েছেন: 'শেরশাহাবাদ' বা 'শেরশাবাদ' [< শেরশাহাবাদ < (শেরশাহ + আবাদ)] (পৃষ্ঠা ২৪)। 'শেরশাবাদ' পরগণা সম্রাট শেরশাহের সময়কালে নির্ধারিত হলেও মুঘল ও নবাবী আমলে নানা পরিবর্তনের পর ব্রিটিশ যুগে ১৮৫০ সাল নাগাদ পরগণাটির সীমাক্ষেত্র যে সর্বশেষ অবস্থায় পাওয়া গেছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন W. W. Hunter (হান্টার) যা নিচে আলোচিত হল।

৪. শেরশাবাদ পরগণার ভৌগলিক বিবরণ ও ইতিহাস

লণ্ডন থেকে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত এবং তৎকালীন ভারত সরকারের স্ট্যাটিসটিক্স বিভাগের ডাইরেক্টর-জেনেরাল W. W. Hunter তাঁর *A Statistical Account of Bengal* গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৭১, ৮৭, ৮৯, এবং ১৪২ পৃষ্ঠায় মোট চারবারই এই পরগণাটির নাম 'শেরশাহাবাদ' ('Shershahabad') উল্লেখ করেছেন। ১৮৭০ সালের রিটার্ণ্ অনুসারে মালদা জেলার অধিন যে ৪৯টি পরগণা ছিলো সেগুলোর বর্ণক্রম অনুযায়ী ৪৫ নম্বর সিরিয়ালে শেরশাহাবাদ পরগণার গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে উক্ত গ্রন্থের ৪২ নম্বর পৃষ্ঠায়। উক্ত সময়ে এর আয়তন ছিল ১,০৬,৫৬৮ একর; এর অধীন ছিল ১৫ টি এস্টেট। এর একটা অংশ মহানন্দা নদীর পূর্বে অবস্থিত [অবিভক্ত দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায়], মূল অংশটি মহানন্দা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী তথা গৌড়কে কেন্দ্র করে অবস্থিত, এবং গঙ্গার পশ্চিমে বাকি অংশটি রয়েছে [মুর্শিদাবাদ জেলায়] (পৃ. ৪২):

> **SHERSHAHABAD: area, 106,568 acres, or 166.50 square miles; 15 estates … This pargana which is the most extensive in the District, is very irregularly shaped, and has many detached fragments. One of these fragments is situated on the farther side of the Ganges, within the District of Murshidabad, and another on the eastern bank of the Mahananda; but a central portion lies between these two rivers, and surrounds the ruins of Gaur (পৃষ্ঠা ৪২)।**

হান্টার *A Statistical Account of Bengal* (৮ম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৭৬) গ্রন্থে রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ৪৮ টি পরগণার লিস্টের ৪৩ নং ক্রমে শেরশাবাদ (Sirsabad) নামের যে পরগণার উল্লেখ করেছেন তার আয়তন ৫৫৬ একর এবং একটি মাত্র এস্টেট নিয়ে এই পরগণাটি গঠিত; এই পরগণার কোর্ট বোয়ালিয়া (Beauleah) বলা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১২১)। মনে হচ্ছে, বৃহত্তর শেরশাবাদ পরগণার একটি ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন করে রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে মালদহের রাজস্বাধীন সবচেয়ে বড় পরগণা ছিল শেরশাবাদ পরগণা যার একটি অংশ মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানার ভিতর ছিল। সেই জন্য তাঁর *A Statistical Account of Bengal* (৯ম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৭৬) গ্রন্থে মুর্শিদাবাদের যে ৬৯ পরগণার সূচী দিয়েছেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই শেরশাবাদ পরগণার আলাদা করে নাম নাই (পৃষ্ঠা ২৩২-৩৬)।

৪. ১. মুঘল হতে ব্রিটিশ: শেরশাবাদের পরম্পরা এবং কয়টি টুকরো ইতিহাস

শেরশাহ যেখানে গোটা বাঙলাকে বিভিন্ন পরগণাযুক্ত একটা 'সরকার' হিসাবে রেখেছিলেন, আকবর সেখানে সমগ্র বাঙলাকে ১৯টি 'সরকারে' ভাগ করেন। শেরশাহের সরকার-ই-বাঙ্গাল হয়ে গেলো সুবা-ই-বাঙ্গাল। আবুল

ফজলের আইন-ই-আকবর গ্রন্থের সূত্রে এম. ও. কার্টার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, ১৫৮২ সাল নাগাদ আকবরের রাজস্ব-মন্ত্রী টোডোরমলের নেতৃত্বে এই ১৯টি সরকারকে [নানান "জাওয়ার" তথা] মোট ৬৮২টি 'মহলে' বিভক্ত করা হয়েছিল (কার্টার: ১৯৩৮, পৃ. ৬২-৬৩)। আকবরের সময় শেরশাবাদের দশটি 'মহল' যে সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার নাম হ'লো জান্নাতাবাদ ওরফে লক্ষ্ণৌতি এবং শেরশাবাদের সেই দশটি মহলের মূল্য ধার্য্য ছিল ৩১,৯২,৩৭৭ দাম (তাম্রমুদ্রা) (প্রাগুক্ত পৃ. ৬৩)। এই সরকারের ইঁটের তৈরী একটা কেল্লা ছিল, ৫০০ টি ঘোড়সওয়ার সৈনিক ও ১৭০০ পদাতিক সৈন্য ছিল (প্রা. পৃ. ৬৩)।

গৌড়ের অনতি দূরে টাঁড়া (Tanda) নামক শহর ছিল টাঁড়া সরকারের মূলকেন্দ্র তথা কিছু বছরের জন্য বাংলার রাজধানী। পরে টাঁড়া সরকারের অন্তর্ভুক্ত রাজমহল মুঘল-বাঙলার রাজধানী হয়েছিল। তারপর ঢাকায় এবং শেষে লালবাগ (মুর্শিদাবাদ)-এ স্থানান্তরিত হয় বাংলার রাজধানী। বলা বাহুল্য, সুলতানী যুগে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়, মুঘল যুগে জান্নাতাবাদ-সরকারের কেন্দ্র ছিল এই গৌড়, আর নবাবী-ইংরেজ আমলে সমস্ত গৌরব হারিয়ে রিক্ত পরিতক্ত অবস্থায় গৌড় রয়ে যায় শেরশাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত এক অতীৎ গৌরব-ইতিহাস হয়ে। শেরশাবাদের ইতিহাসের জরুরী কিছু তথ্য নিচে আলোচনা করা হলো।

৪. ১. ১. শেরশাবাদ যখন পূর্ণিয়ার একটি পরগণা

১৮১৩ সালে মালদহ পুলিশ-জেলা গঠন এবং ১৮৩২ সালে মালদহে ট্রেজারী স্থাপিত হওয়ার আগে পর্যন্ত মালদহ জেলার অধিকাংশ এলাকা ছিল পূর্ণিয়া জেলার নিয়ন্ত্রনে। উত্তরের নেপাল-লাগোয়া তরাই-অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণে মহানন্দা-গঙ্গার মিলন-মোহনা গোদাগাড়ি পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পশ্চিমের সমগ্র ভুখণ্ড ছিল পূর্ণিয়া জেলার অংশ। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কর্তৃক ১৭৭০ সালে পূর্ণিয়া একটি জেলারূপে গঠিত হলে শেরশাবাদ পরগণার গঙ্গা-মনহন্দার মধ্যবর্তী সমগ্র গৌড়াঞ্চল পূর্ণিয়া জেলার অধীন রয়ে যায়। ফ্রান্সিস বুকানন (Francis Buchanan)-এর *An Account of the District of Purnea in 1809-10* গ্রন্থে পূর্ণিয়া জেলার পরগণাসমূহের বর্ণনায় প্রথমে শেরশাবাদের নাম স্থান পেয়েছে। গ্লাডউইনের আইনী আকবার-এর অনুবাদের রিফারেন্স দিয়ে তিনি একই বানান অনুসরণ করে শেরশাবাদকে লিখেছেন 'Sersabad' এবং তাঁর মতে এই এস্টেটের আয়তন প্রায় তিন লক্ষ বিঘা বা এক লক্ষ একর। এই জেলার শিবগঞ্জ ডিভিসনের অন্তর্গত শেরশবাদ পরগণার প্রশংসায় বুকানন বলেন:

> It includes a large portion of Gaur, is all in the immediate vicinity of that capital, and is almost all arable land. This noble estate, with many others, formerly belonged to the family which performed the office of Register-

general (Kanungoe) for ten-sixteenths of Bengal, and the same family still retains a considerable part of this estate, where it formerly resided; but some time ago it retired to Murshedabad. (পৃষ্ঠা ৪৫৪)

শেরশাবাদ পরগণার উত্তরাধিকারী কানুনগো-পরিবার প্রসঙ্গে এম. ও. কার্টারের *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda: 1928-1935* (১৯৩৮) গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠা থেকে জানতে পারা যায়, সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমল মুঘল সম্রাজ্যে যে দশজন কানুনগো নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর মধ্যে প্রথম হলেন ভগবান মিত্র। ভগবান মিত্রের পর তাঁর ভাই বঙ্গ বিনোদ ঐ পদের অধিকারী হন। বুকানন তাঁর উক্ত গ্রন্থের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় বিবরণ দিয়ে বলেন যে, কানুনগো-পরিবারটি "বঙ্গাধিকারী মহাশয়" টাইটেল গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রথম ব্যাক্তি ছিলেন 'ভগবান' নামের একজন উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ পুরুষ। তাঁর পর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পালিত পুত্র বঙ্গবিনোদ রায় (কার্টারের মতে 'ভাই' যা সঠিক মনে হচ্ছে না)। বঙ্গবিনোদের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পালিত পুত্র হরিনারায়ণ। হরিনারায়ণের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পালিত পুত্র দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র বোধনারায়ণ যিনি তাঁর সম্পত্তি তাঁর ভাই শিবনারায়ণকে দিয়ে যান। শিবনারায়ণের এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর পালিত পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের পর তাঁর পালিত পুত্র সূর্য্যনারায়ণ উত্তরাধিকারী হন। সূর্য্যনারায়ণের পর তাঁর পালিত পুত্র চন্দ্রনারায়ণ উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, যদিও ১৮১০ সাল নাগাদ তিনি নাবালক ছিলেন। এই আটজন উত্তরাধিকারীদের মাত্র একজনের নিজস্ব পুত্র ছিলো। (বুকানন ৪৫৫ পৃ.)

ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট শেরশাবাদের জমিদার চন্দ্রনারায়ণের একটি আপীল ও সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত মুদ্রিত হয়েছে গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৮৩২ সালে প্রকাশিত একটি বই-এ। এই বইটির দীর্ঘ শিরোনাম হলো: *Minutes of Evidence Taken Before the Select Committee on the Affairs of the East India Company and also an Appendix and Index, III. Revenue* (printed under the order of The House of Commons, Parliament, Geat Britain, 1832) । এই গ্রন্থের ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত Appendix No. 53-এর মধ্যে শেরশাবাদের বানান লেখা আছে 'শেরশাহাবাদ' ('Shershahabad')। এই পরগণার ৩১০১ টি মৌজাযুক্ত এই এস্টেটের খাজনা জমিদার চন্দ্র নারায়ণ রায় (Chunder Narayan Roy) জমা দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ (Moorshedabad) কালেক্টারের ট্রেজারীতে। ১৮২১-২২ সালে এই জমিদারি এস্টেটের ৩১০১ টি মৌজার দাম ৪,৬৯,৯৯৫ টাকা ধার্য্য থাকলেও বাজার দর অনুসারে ৬৭,৩৭৩ টাকা মুর্শিদাবাদের ট্রেজারীতে জমা হয়েছিল।

শেরশাহাবাদ (Shershahabad) সম্পর্কিত এই বিবরণটি ফারসী ভাষায় লিখিত নথি-তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি চিঠিতে লিখেছেন পাটনাস্থিত অফিস থেকে বিহার-বেনারসের যুগ্ম কমিশনার C. F. Fergusson এবং H. Newnham এবং চিঠিটি পেশ করা হয়েছে, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ভবনস্থিত ইংরেজ সরকারের প্রধান লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট। চিঠির তারিখ ১২ মার্চ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ (পৃ. ১৪৫-১৪৬) ।

৪. ১. ২. শেরশাবাদ পরগণার একটা অংশ দিনাজপুর জেলার অধীন

আগের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি যে, এই পরগণার এক বড় অংশ ছিল অবিভক্ত পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে তথা মুর্শিদাবাদ কালেক্টরেটের রাজস্বাধীন। এবার শেরশাবাদ পরগণার যে অংশটি তৎকালীন জেলা দিনাজপুরের অধীন ছিল তার প্রসঙ্গটি পাওয়া যাচ্ছে ১৮৭৬ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক কোলকাতা হতে প্রকাশিত *The Indian Law Reports* (Vol. I): Calcutta Series গ্রন্থের ৩৮৩-৮৫ পৃষ্ঠায়। এখানে ১৮৭৬ সালের এপ্রিল ৪ তারিখের একটি কেসের বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে এই সময় শেরশাবাদ (Shershabad) জমিদারি এস্টেটের মালিক ছিলেন জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী। শেরশাবাদ এস্টেটের কিছু অংশ তৎকালীন দিনাজপুর জেলা (Zilla Dinagepore)-র অধীন ছিল (পৃষ্ঠা ৩৮৩-৮৫)।

কীভাবে বঙ্গাধিকারী পরিবারের নিকট থেকে শেরশাবাদ (Shershabad) জমিদারিটি সূর্যকান্ত আচার্যের অধিকারে আসে, সেই প্রসঙ্গটি এম. ও. কার্টার উল্লেখ করেছেন তাঁর *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda: 1928-1935* (১৯৩৮) গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায়। বঙ্গাধিকারী পরিবারটি কোনো এক সময় অর্থের তাগিদে এই পরগণার সম্পত্তিগুলো রাণাঘাটের চৌধুরী-মহাজনদের কাছে বন্ধক দেন। পরে আর বন্ধকমুক্ত করতে না পারায়, ঐ মহাজনরা পরগণাটির সহ-অংশীদার হয়ে যান। কিন্তু সুদূর রাণাঘাট থেকে এই পরগণার দেখভাল প্রায় অসম্ভব হওয়ায় তাঁরা পরগণাটি পাটনি-লীজে বিক্রী করেন এবং তা কেনেন কালিয়াচকের নীল-ফ্যাক্টরীর মালিক জন জেমস গ্রে (John James Gray)। পরে ক-এক হস্তান্তরের পর ১৮৭৩ সাল থেকে শেরশাবাদ পরগণার জমিদারী হাসিল করতে থাকেন ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য এবং ১৯২৮-৩৫ সময়কালের কার্টারের সার্ভে রিপোর্ট লেখার সময় এর মালিক ছিলেন তাঁর পুত্র মহারাজা শশীকান্ত।

৪. ১. ৩. শেরশাবাদ পরগণা: প্রসঙ্গ মালদহ জেলা

আগের আলোচনা থেকে জেনেছি শেরশাবাদ পরগণার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়া জেলার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এবার জানবো মালদহ জেলায় এই পরগণার অংশসমূহের টুকিটাকি আরো কয়টি তথ্য। পুলিশ-প্রশাসনিক

জেলা হিসাবে মালদহ জেলা ঘোষিত হয় ১৮১৩ সালে। তার আগে খরবা (বর্তমানে চাঁচল), তুলসীহাটা (বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুর), রাতুয়া, মানিকচক ও কালিয়াচক (ইংরেজবাজার-শিবগঞ্জ সহ) ছিল অখণ্ড পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভূক্ত। আর মহানন্দা নদীর পূর্বে অবস্থিত গাজল, হবিবপুর, মালদহ (এখন পুরাতন মালদহ) -- এই তিনটি থানা ছিল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার অধীন। এই সব থানাসহ রাজশাহী জেলার রোহনপুর-গোমস্তপুর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ থানা নিয়েই অখণ্ড মালদহ জেলাটি তৈরী হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে (এম. ও. কার্টার:১৯৩৮, পৃ.৬৪)। উনিশ বছর পরে ১৮৩২ সালে এই জেলার ট্রেজারী স্থাপিত হয় এবং এর সাতাশ বছর পর ১৮৫৯ সালে মালদহ জেলা পূর্ণরূপে কাজ করতে শুরু করে (ল্যাম্বরণ:১৯১৮ পৃ. ২৩)। সুতরাং শেরশাবাদ পরগণার কিছু অংশ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ও তার পরেও দিনাজপুরের ভেতরে থাকার মানে গাজল (দক্ষিণ অংশ), হবিবপুর ও বামনগোলার অংশসমুহ এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাই হোক, সেটলমেন্ট অফিসার এম.ও. কার্টার যখন ১৯২৮-৩৫ সময়-কালে মালদা জেলা সার্ভে করছিলেন তখন ৫৩ টি পরগণার রেকর্ড-লিস্ট দেখেন; এই লিস্টের ৪৭ নম্বর সিরিয়ালে ছিল শেরশাবাদ পরগণা (কার্টার, পৃষ্টা ৬৪) ।

এই পরগণার কোনো কোনো জায়গা করমুক্তভাবে দান করেছেন এর মালিকগণ তথা সরকার এবং এর ফলে এই পরগণা ভেঙে আলাদা এস্টেট তথা পরগণার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। পরগণার ভেতর অণু-পরগণার অস্তিত্ব রয়েছে আরো সব বিভিন্ন কারণে, এটাই আমার অভিমত। শেরশাবাদ পরগণার বিভিন্ন জায়গা করমুক্তরূপে দান করা হতো সেটা আমরা জানতে পেরেছি এই পরগণার ভূতপূর্ব মালিক বঙ্গাধিকারী পরিবার প্রসঙ্গে কার্টারের আলোচনায় (কার্টার:১৯৩৮, পৃ. ৬৫) । জি. ই. ল্যাম্বরন উল্লেখ করেন যে মুঘল-সম্রাটদের অনুমোদোন সাপেক্ষে স্থানীয় শাসকগণের এই রকম দুটো এস্টেট হলো সাসহাজারী এবং বাইশহাজারী এস্টেট – যা পাওয়াকে কেন্দ্র করে সমাজের শিক্ষা ও জনকল্যানের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল (*Bengal District Gazetters: Malda*, 1819 পৃ. ৭৩)। শিবগঞ্জ থানায় শেরশাবাদ পরগণার অন্তর্গত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ করমুক্ত জমি হলো পাঁচ হাজার (৫০০০) একর জমিযুক্ত 'তরফ পিরিগপুর' (Taraf Pirigpur) এলাকাটি। এটি জনকল্যানের জন্য আওরঙ্গজেব দান করেছিলেন ইসলামী প্রচারক সন্ত শায়খ সৈয়দ নিয়ামাতুল্লাহকে (প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪; W. W. Hunter, *A Statical Account of Bengal*, Vol. VII, পৃ. ৮৪-৮৫) ।

৫. শেরশাবাদের মুসলিম কৃষক-সম্প্রদায়: হান্টার, ল্যাম্বরণ ও এ. মৈত্রের বর্ণনা

১৮০৯-১০ সালের দিকে এই পরগণার মাটিকে arable বা উর্বর বলে প্রশংসা করেছেন বুকানন তা উপরে দেখিয়েছি। এর প্রায় ৬৫ বছর পরে হান্টার

এখানকার "সব রকমের ফসল উৎপাদনে সক্ষম উর্বর মাটি"-র প্রশংসায় লিখেন: **"The soil produces all manner of crops without irrigation, and does not require much tillage, owing to its loose nature"** (হান্টার পৃ. ১৪২)। তিনি আরো বর্ণনা করেন, বিশ বছর আগে এই পরগণায় গৌড়ের আশেপাশে যেখানে শুধুই জঙ্গল ছিল, সেখানে এখন প্রচুর ধান উৎপাদন হচ্ছে; জেলার অন্য অংশের মতই গৌড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গোমস্তাপুর ও নাবাবগঞ্জে উল্লেখযোগ্য হারে এ উৎপাদন বেড়েছে (হান্টার, পৃ. ৭১)।উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ব্রিটিশ সরকারের ভূমি ও রাজস্ব সংস্কারের সুফল যে শেরশাবাদ পরগণায় পাওয়া গেছিল, তারও বর্ণনা আমরা পাই হান্টারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সরকারের আয়ও বেড়ে যায়। ১৮৪২ সালের মালদহ জেলা কালেক্টরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে হান্টার বিবরণ দিচ্ছেন যে শেরশাহাবাদ পরগণায় ১৮৪২ সালের পর ত্রিশ বছরে জমির খাজনা বেড়েছিল ১/৩ বা এক-তৃতীয়াংশ (পৃ. ৮৯)।

এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে চাষাবাদের এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে শেরশবাদের (অর্থাৎ শেরশাবাদিয়া) কৃষক-সম্প্রদায়ের বিশেষ অবদান রয়েছে, যদিও হান্টার কোথাও 'শেরশাবাদিয়া' শব্দটি উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত্ব, জনজাতির পরিচয় হিসেবে শেরশাবাদ পরগণার মুসলিম কৃষক শ্রেণীর 'শেরশাবাদিয়া' নামটি তখনও সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মালদহের মুসলিমদের প্রসঙ্গে হান্টার বলেন:

> **The Muhammadans were found by the Census of 1872 to number 3,10,890, or 46 per cent of the District population. They are for the most part an active and energetic race, -- a fact which may be due to their being largely descended from the conquerors of Gaur and Panduah. … A great many of them belong to the Faraizi and Wahabi sects; and in 1869 several prosecutions for abetment of waging war against the Queen were instituted in this District.** (পৃষ্ঠা ৪৭)

এখানে হাণ্টার উল্লেখ করেছেন যে মালদহের মুসলিমদের এক বিরাট সংখ্যা ফারায়েজী এবং ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত (পৃ. ৪৭) যা সাধারণভাবে এই এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শেরশাবাদিয়া সমাজের একটা ধর্মীয় বৈশিষ্ট। তাছাড়া, ভারতসহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাণী ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ উস্কানোর দায়ে এদের কারো-কারোর বিরুদ্ধে ১৮৬৯ সালে বিচার চলেছিল (পৃ. ৪৭), হান্টারের এই বর্ণনাও ইঙ্গিত করছে এটা শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ঘটনা। হান্টার-বর্ণিত এই মুসলিমগণ যে শেরশাবাদিয়া, তা নিশ্চিৎভাবে জানা যায় জি. ই. ল্যাম্বরণের *মালদা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার*-এ (১৯১৮):

> **All the Mahomedans are Sunnis, and with the exception of numbers of the Shershabadis, of the Hanifi persuasion. The prevailing doctrine amongst the**

> **Shershabadis is that known as Farazi, though different groups are known by such names as Lamazhabis, Wahabis, Hadayat. The common feature of these schisms is that they profess to base themselves on the text of the Koran and do not adhere to any of the regular schools of doctrine into which the Mahomedan religious world is divided. ... In 1869 several prosecutions for waging war against the Queen were instituted against Wahabis. (পৃষ্ঠা ২৮-২৯)**

মলদহের যে মুসলিমদের একটা শক্ত-সবল কর্মঠ জাতি (race) বলেছেন হান্টার এবং এর একটা কারণ তিনি মনে করেছেন যে, এদের এক বড় অংশ গৌড়-পাণ্ডয়ার বিজেতাগণ (conquerors)-এর বংশধর ছিল (পৃ. ৪৭), তারা আসলে শেরশাবাদিয়া এবং এর সমর্থন পাই জি. ই. ল্যাম্বরণের মালদা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে (১৯১৮):

> **… it is said that the Mahomedans of the Shershabad pargana of Sibganj police-station, known as Sherhabadis, show traces of descent from the foreign immigration of the time of the Mahomedan dynasties. It would appear, however, that the physical advantages which these people enjoy can be partly ascribed to the healthiness of the climate of the Gangetic chars. (পৃষ্ঠা ২৭)**

ল্যাম্বরণ অবশ্য কথিত ("it is said") কথার বিদেশী উপাদানের কথাকে একপাশে রেখে, গাঙ্গেয় চর-এলাকার সাস্থ্যকর পরিবেশ-আবহাওয়াকেই শেরশাবাদিয়া জনজাতির সুসাস্থ্যের কারণ ভেবেছেন (পৃষ্ঠা ২৭)। এর সঙ্গে হান্টারের একটা যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। সেটা এই যে, তাদের সুস্থ থাকার পেছনে তাদের কৃষিকাজের পেশা একটা বড় কারণ। রোগজীবাণুর আখড়া আগাছা-যুক্ত জলাভুমি ও জঙ্গল সাফ করে কৃষিযোগ্য করে ফসলোৎপাদনই শেরশাবাদিয়াদের বড় লক্ষ্য। হান্টার তৎকালীন মালদহের সিভিল সার্জেনের রিফারেন্সে বলেন যে, জ্বর ও কলেরাসহ বিভিন্ন মহামারীর প্রাদুর্ভাব জেলার জলা-জঙ্গলে ভরা প্রান্ত এলাকাগুলিতে বেশি আর প্রথমে ঘটে, এবং ভেতরের তথা কৃষিপ্রধান এলাকায় দেরিতে প্রবেশ করে (পৃ. ১৪৭)।

শেরশাবাদের যে অংশ মুর্শিদাবাদে আছে সেখানকার শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের পেশা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন জনগণনার সুপারিন্টেন্ডেন্ট এ. মৈত্র কর্তৃক রচিত *Census 1951, West Bengal: District Handbooks, Murshidabad* গ্রন্থে এদের বিবরণ পাওয়া যায় যে, অতি উর্বর পলিমাটি সম্পন্ন ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ ও রঘুনাথগঞ্জ থানাগুলিতে মুলত্ব শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায় বাস করে যারা সু-আয়ু ও সু-সাস্বাস্থের অধিকারী:

> **Farakka, Samserganj and Raghunathganj police stations are exceptionally fertile alluvial areas inhabited largely by a sturdy community called the**

> **Shershabadia Muslims, among whom mortality is low and health is good (পৃষ্ঠা xii)।**

শেরশাবাদিয়াগণ গঙ্গার ধার বরাবর আশেপাশের ব্লকগুলিতে অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন সেই ইঙ্গিতও এ. মৈত্র উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

> **Muslims predominate in the Sadar, Lalbagh and Jangipur subdivisions and are scattered over Bharatpur, Burwan and Khargram police stations of Kandi subdivision. There is a small Sia commumty of Muslims in Lalbagh, the rest being mostly Sunnis and Sheikhs. There is a community of Shershabadia Muslims on the river line of the Ganges (পৃষ্ঠা xiv)।**

গঙ্গার সুস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, পার্শ্ববর্তী উর্বর মাটি এবং কর্ষণকাজ এই জনজাতির সুসাস্থ্যের বড় কারণ।

৬. শেরশাবাদিয়া জনজাতি: ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ১ম স্বীকৃতি

জনজাতির পরিচয় হিসাবে 'শেরশাবাদিয়া' (Shershabadia) শব্দটি আমি প্রথম যে গ্রন্থটিতে লক্ষ্য করেছি, সেটি হলো সরকারি অফিসার ই. এ. গেইট কর্তৃক রচিত এবং বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস (ক্যালকাটা) হতে ১৯০২ সালে প্রকাশিত ভারত সরকারের ১৯০১ সালের জনগণনা বা *সেন্সাস রিপোর্ট* (৬ষ্ঠ খণ্ডের ১ম ভাগ)। এই গ্রন্থে ১১তম অধ্যায়ে বাঙলার উপজাতি (Caste) সমূহের বর্ণনা রয়েছে। সেখনে শেখ মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে শেরশাবাদিয়া জনজাতিকে। এ প্রসঙ্গে দ্বারভাঙ্গা থেকে ১৮৫০ সালের আশেপাশে মালদহে আগত মুসলিম সম্প্রদায় এবং স্থানীয় শেরশাবাদ পরগণার পুরাতন অধিবাসীদের যথাক্রমে দ্বারভাঙ্গিয়া এবং শেরশবাদিয়া জনজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে:

> **In some places there are regular sub-castes, e.g., in Malda, where there is a small settlement of immigrants who came from Darbhanga some fifty years ago; they are known as Darbhangia Shekhs and marry only within their own community. There is another endogamous community in the same district known as Shershabadia who are said to be very good cultivators. (Chapter XI: Caste, p. 450)**

এই গ্রন্থে মুসলিম 'শেরশাবাদিয়া' জনজাতিকে কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তথা 'শেখ' জাতি (caste)-র মধ্যে একটি উপজাতি (sub-caste) হিসাবে বর্ণনা ক'রে উন্নত কৃষক গোষ্ঠীরূপে ("very good cultivators") প্রশংসা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৪৫০)। বলা বাহুল্য, 'শেরশাবাদিয়া'-র মতই 'দ্বারভাঙ্গিয়া' নাম-পরিচয়টি দ্বারভাঙ্গা স্থাননামে "ইয়া" প্রত্যয় যোগে তৈরী হয়েছে (আবদুস সামাদ, *বাংলার মুসলিম জনজাতি*, ৩য় সংস্করণ, কোলকাতা: বাকচর্চা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৯)।

৭. ‘শেরশাহবাদ’ এবং ‘শেরশাহবাদিয়া’: ভুল বানানের দুটি শব্দ

উপরে আলোচিত আবুল ফজল (১৬০২), ফ্রান্সিস গ্লাডউইন (১৮০৯-১০), হান্টার (১৮৭৬), ল্যাম্বরণ (১৯১৮), কার্টার (১৯৩৮) সহ বহু গ্রন্থের সাহায্যে এটা প্রমাণিত যে পরগনার নাম ‘শেরশাবাদ’ তথা ‘হা'-যুক্ত ‘শেরশাহাবাদ’। এই নামটির ‘হ’-যুক্ত ভুল বানান ‘শেরশাহবাদ’ প্রথম পরিলক্ষিত হয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মুখ্য সম্পাদনায় সংকলিত “বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান”-এ। এই ভুল বানানটি ঘটেছে হয় মুদ্রণ প্রমাদ জনিত কারণে অথবা ঐতিহাসিক/ ভৌগলিক তথ্যের উপর নির্ভর না করার কারণে। উক্ত অভিধানের উক্তিটি বিচার করা যাক কীভাবে শব্দটি এসেছে:

> “বাদিয়্যা = [রা] -- বি. শেরশাহবাদ পরগনার অধিবাসী।। বাদিয়্যারা খুব্ দুশ্‌টৃ। [< বাদিয়া]।” [১ম প্রকাশ: ১৯৬৫, ২য় পুনর্মুদ্রণ ২০০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৫২]।

বলা বাহুল্য অভিধানটি যে দোষমুক্ত নয় সেটি শুরুতেই “প্রসঙ্গ-কথা”য় এটি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রকাশক বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মাযহারুল ইসলাম।

তাই, শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রথম গবেষণা গ্রন্থ *শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য* (১৯৮৯)-এর মধ্যে গ্রন্থকার আবদুস সামাদও কোথাও 'হ'-যুক্ত 'শেরশাহবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেননি, বরং সঠিক বানান 'শেরশাবাদ'/'শেরশাহাবাদ' নামটিরই উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। অথচ 'হ'-যুক্ত উক্ত ভুল বানানটি ব্যবহার করেছেন শেরশাবাদিয়া ভাষার উপর পরবর্তী গবেষক মীর রেজাউল করিম তাঁর *শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি* (১৯৯৯) গ্রন্থে। রেজাউল করিমের পুস্তকের মূল ফোকাস এই সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি যা তিনি আবদুস সামাদের সুত্র ধরে সিস্টেমেটিক ও সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ফোকাস যেহতু ইতিহাস নয়, তাই ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে সমস্যা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই রকম কয়েকটি ভুল লক্ষ্য করা যাচ্ছে বই-এর শুরুতে। তাঁর কথায়:

> “শেরশাবাদিয়া শব্দটি নিরুক্ত হয়েছে শেরশাহবাদ থেকে [শেরশাহবাদ + ইয়া (প্রত্যয়) = শেরশাহবাদিয়া > শেরশাবাদিয়া > বাদিয়া]। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত “বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান”-এ শেরশাহবাদ পরগণার অধিবাসীদের শেরশাবাদিয়া বা বাদিয়া বলা হয়েছে। প্রখ্যাত গবেষক এম. ও. কার্টার একই মত পোষণ করে বলেছেন, ‘শেরশাবাদিয়া’ বা ‘বাদিয়া’ নামটি শেরশাহবাদ পরগণা থেকে নিরুক্ত হয়েছে।” [রেজাউল করিমের উক্ত গ্রন্থ, ১ম প্রকাশ: ১৯৯৯, প্রকাশক: ডা. জেড. এস. আকুঞ্জি, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ১]।

রেজাউল করিমের বই-এর এই উক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত ভুলগুলো হলো:

১. **মুহম্মদ শহীদুল্লাহর “বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান”-এ “শেরশাবাদিয়া” শব্দটির কোনো উল্লেখ নাই। তাই, শেরশাবাদিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তির রিফারেন্স হিসেবে এই অভিধানের উল্লেখ ভ্রান্তিকর।**

২. **‘শেরশাবাদিয়া’ থেকে ‘বাদিয়া’ কথাটি এসেছে এমন কোনো কথা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত উক্ত অভিধানে নেই। বরং বাদিয়া শব্দের যে অর্থ উক্ত অভিধানে রয়েছে তার সঙ্গে রেজাউল করিমের বক্তব্য মিলছে না। উক্ত অভিধানে আঞ্চলিক শব্দ হিসাবে 'বাদিয়া' শব্দের অর্থ এইভাবে দেয়া আছে:**
“বাদিয়া = [রা, রং] -- বি. গরু ছাগলের খাসীকারী, চামড়ার ব্যবসায়ী। [অর্থ প্র.]” (পৃষ্ঠা ৭৫২, উক্ত অভিধান)। অর্থাৎ রাজশাহী এবং রংপুরে গরু ছাগলের খাসীকারী, চামড়ার ব্যবসায়ী বিশেষ সম্প্রদায় বাদিয়া নামে পরিচিত। এদের সঙ্গে শেরশাাবাদিয়াদের কোনো যোগ নেই।

৩. **উক্ত অভিধানে পরগণাটির ভুল নাম “শেরশাহবাদ” থেকেই সম্ভবত: রেজাউল করিম ধরে নিয়েছেন যে “শেরশাহবাদ” থেকে “শেরশাহবাদিয়া” কথাটি নিরুক্ত হয়েছে যদিও এমন কথা এর আগে কেউ বলেননি। এ ক্ষেত্রে *শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য* গ্রন্থের লেখক আবদুস সামাদের ব্যাখাটি যথার্থ ও ইতিহাস সম্মত যে স্থাননাম ‘শেরশাবাদ’/ ‘শেরশাহাবাদ’ থেকে 'শেরশাবাদিয়া' নামটি এসেছে। সুতরাং, ‘শেরশাহবাদ’-এর মতই ‘শেরশাহবাদিয়া’ নামটি ভুল।**

৪. **এম. ও. কার্টার তাঁর *ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে এণ্ড সেট্‌লমেন্ট অপারেশনস ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব মালদা ১৯২৮-১৯৩৫* গ্রন্থে কোত্থাও শেরশাহবাদ শব্দটি উল্লেখ করেননি। গ্রন্থটির সর্বত্র তিনি ‘হ(h)’-ছাড়াই ‘শেরশাবাদ (Shersabad)’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। রেজাউল করিম কার্টারের ৪৫ পৃষ্ঠার রেফারেন্স দিয়েছেন। ঐ পৃষ্ঠা থেকে পুরো উক্তিটি লিখছি:**

> **The name [Shersabadiya] is derived from Shersabad Pargana of Murshidabad district, from which they were forced to emigrate owing to the erosion of the Ganges (45).**

এম. ও. কার্টার কোথাও উল্লেখ করেন নি যে “বাদিয়া” কথাটি “শেরশাবাদিয়া” থেকে এসেছে।

৮. “বাদিয়া” কথাটা “শেরশাবাদিয়া”র সংক্ষিপ্ত রূপ নয়

শেরশাবাদিয়াদের কোথাও কোথাও বিকৃতভাবে বাদিয়া বলা হয়। এ ব্যাপারে ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত "বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান" (১৯৬৫, অখণ্ড সংস্করণ) বই-এ রাজশাহী এলাকায় প্রচলিত একটা আঞ্চলিক শব্দ আলাদা বানানে লেখা আছে সেটা হলো 'বাদিয়্যা' যার অর্থ তিনি লিখেছেন: "শেরশাহবাদ পরগণার অধিবাসী" এবং এই শব্দের উৎস হলো 'বাদিয়া': -- "বাদিয়্যা < বাদিয়া" (পৃষ্ঠা ৭৫২)। এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে শেরশাবাদিয়া শব্দ থেকে "বাদিয়া" কথাটা আসেনি।

"বাদিয়া" থেকে বাদিয়্যা শব্দটি এসেছে এবং এটি একটি স্বাধিন শব্দ। এটি বুঝতে অসুবিধা হবে না যদি এই শব্দের অর্থ সঠিকভাবে জানার চেষ্টা করি। "বাদিয়া" শব্দটি মূলত্ব আরবী যা যাযাবর তথা গাঁইয়া অর্থে ব্যবহৃত। আরবী ভাষায় 'বাদিয়া' [Bādiya: بادية] শব্দের যে কয়টা অর্থ হয়, তার এক অর্থ যাযাবার (nomads/gypsy) তথা বেদুইন (bedouins)। বুঝার জন্য Hans Wehr এবং J. Milton সম্পাদিত এবং নিউ ইওর্কের Spoken Language Services Inc দ্বারা পোর্কাশিত *A Dictionary of Modern Written Arabic* গ্রন্থ থেকে 'বাদিয়া' শব্দের সবগুলো অর্থ লিখে দিলাম: "desert, semidesert, steppe; peasantry; nomads, Bedouins" [মরুভূমি, আংশিক মরু অঞ্চল, প্রান্তর; দেহাতী বা গাঁইয়া মানুষ; যাযাবর, বেদুইন] (পৃষ্ঠা ৪৮, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৬)।

৯. "শের শাহ আবাদী" (Sher Shah Abadi): একটি বিভ্রান্তিকর নতুন বানান

পরগণার নাম শেরশাবাদ বা শেরশাহাবাদ। সুতরাং স্থাননামে 'ঈ' বা 'ইয়া' প্রত্যয়যোগে এই পরগণার ভাষা ও জনগণকে শেরশাবাদী/শেরশাবাদিয়া বা শেরশাহাবাদী/শেরশাহাবাদিয়া বলা যায়। বলা বাহুল্য, "শেরশা/শেরশাহ" নাম চিহ্নিত 'আবাদ' (জনপদ) কে শেরশাবাদ/শেরশাহাবাদ বলা হয়। শব্দটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ: শেরশা + আবাদ = শেরশাবাদ [আ+আ = আ] এবং শেরশাহ + আবাদ = শেরশাহাবাদ [অ + আ = আ]। সুতরাং জনপদসূচক এই সন্ধিবদ্ধ তথা সমাসবদ্ধ অখণ্ড শব্দ শেরশাবাদ বা শেরশাহাবাদকে খণ্ডিত করে "শের শাহ আবাদ" লেখা যেমন এক ধরণের পাগলামি হবে, ঠিক তেমনই 'ঈ/ইয়া' প্রত্যয় যোগে এই ভুল স্থাননাম থেকে জনজাতির একটি খণ্ডিত নাম আবিষ্কার করে "শের শাহ আবাদী" লেখাও বিভ্রান্তিকর। অথচ এমনই একটি ভুল নামে শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠিকে চিহ্নিত করা হয়েছে পর্বে উল্লেখিত মহ. আক্রামুল হকের *Influence of Arabic on the Bengali Dialect of Sher Shah Abadi Dialect* (2011-2015, Arabic Department, Assam University) শিরোনাম-যুক্ত পিএচডি থিসিসে এবং এই থিসিস সম্বন্ধিত তাঁরই দুটি নিবন্ধে যে দুটি হলো:

১. “Sher Shah Abadi Community: A Study from Historical Perspective” in *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS),* Vol.-II, Issue-I, July 2015, Pages 278-28, Scholar Publications, Karimganj, Assam.
২. “Arabic influence on Sher Shah Abadi Dialect” in *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)*, 2015, Vol. 2, No. 8, pages 33-38, http://www.ijims.com/uploads/ac33ba 32d 689330ac7216.pdf.

প্রথম নিবন্ধটি হলো উক্ত থিসিসের ২য় চ্যাপ্টারের সারাংশ যার শিরোনাম “Origin and History of Sher Shah Abadi Community” (পৃ. ১৩-৯১)। এটি থিসিসের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট হিসেবে লিখিত। দ্বিতীয় নিবন্ধটি হচ্ছে থিসিসের ৩য় চ্যাপ্টারের সারাংশ যার শিরোনাম হলো “Influence of Arabic on Shershah Abadi Dialect” (পৃ. ১০৪-১৬৫)। থিসিসের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শেরশাবাদিয়া ভাষার শব্দভাণ্ডারে আরবী শব্দের উপস্থিতি নিয়ে আক্রামুল হকের গবেষণাটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত। কিন্তু, শেরশাবাদ পরগণা ও শেরশাবাদিয়া জনজাতির নাম নিয়ে বেশ কয়েকটি ভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তি ঘটেছে এই লেখাগুলির মধ্যে। সেগুলোর আলোচনা করা হল নিচে।

১. শেরশাবাদ বনাম শেরশাহবাদ

আমরা উপরের আলোচনায় ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে পরগণার নাম “আবাদ” যুক্ত শেরশাবাদ বা শেরশাহাবাদ, কিন্তু “বাদ” যুক্ত শেরশাহবাদ কোনোভাবেই ইতিহাস-সম্মত নয়। আক্রামুল হকের থিসিসের উক্তিই তার প্রমাণ:

> According to our collected data the British surveyors like M.O. Carter, G.E. Lambourn, W.W. Hunter, a particular Muslim group of people who had been living at Shershabad pargana of present Malda and Murshidabad region were called Shershabadis or Shershahbadiyas (১ম চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ৩)।

এই উক্তিতে ল্যাম্বরণ এবং কার্টারের বানান অনুযায়ী পরগণার নাম সঠিকভাবেই “শেরশাবাদ” (Shershabad) বলা হয়েছে। আবার ল্যাম্বরণের বানান অনুযায়ী জনজাতির নাম সঠিকভাবেই “শেরশাবাদী” (Shershabadi) লেখা হয়েছে। কিন্তু কার্টারের বানান-যুক্ত শেরশাবাদিয়া (Shersabadiya) শব্দের বিকৃত করে “শেরশাহবাদিয়া” (Shershahbadiya) করা হয়েছে থিসিসে যা হয়তো মুদ্রণ-দোষে হয়েছে।

আবার, জে. জে. পেম্বার্টনের *Geographical and Statistical Report of the District of Maldah*, (Calcutta, 1854) গ্রন্থে উল্লেখিত ম্যাপ-অনুযায়ী পরগণার নাম শীরশাহাবাদ (Sheershahabad) এবং ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের *এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল*

একাউন্ট অব বেঙ্গল (৭ম ভলিউম)-এ উল্লেখিত বানান অনুযায়ী পরগণার নাম শেরশাহাবাদ (Shershahabad) সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন গবেষক:

> It [Kankjole] was connected with Shershabad Pargana. It is found that- "Eastern Portion (of Kankjole): This portion is situated on the Sheershahabad Map." It is also found that- "The eastern portion (of Kankjol) is contained within Shershahabad Pargana." (৩য় চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ১০৭)।

কিন্তু, উক্ত গবেষকের এই সব তথ্যের ভাণ্ডার থাকা সত্বেও এবং থিসিসের মধ্যে পরগণার নাম সঠিকভাবে প্রায় ২১ বার "শেরশাবাদ" (Shershabad) লিখলেও ভুলবশত্ব বা মুদ্রণদোষের কারণে প্রায় ২০ বার "শেরশাহবাদ" (Shershahbad) লিখা রয়েছে যা এক গুরুচণ্ডালী দোষ বা বিভ্রান্তি। একই ধরণের গণ্ডগোল ১ম নিবন্ধটির মধ্যে ঘটেছে।

২. শেরশাবাদী বনাম শের শাহ আবাদী

দু-একটি মিথ্যে কথা জোর করে ঢুকিয়ে "শের শাহ আবাদী" শব্দটাকে সঠিক বলার চেষ্টা হয়েছে উক্ত থিসিসে। থিসিস হতে নীচে কয়েকটি উক্তি বিচার করা যাক:

> It is to be noted that the term 'Sher Shah Abadi' had few distorted forms. According to G. E. Lambourn the term was that - ".....especially amongst the Mahomedans known as Shershabadis." According to M.O.Carter the term was that - "The Shersabadiyas, among the Muhammadan agriculturists, the most remarkable people are those known as the Shersabadiyas, or more generally as the Badiyas." According to P. C. Roy the term was - "This class of people were named after Shershah and known as Shershahabadia." (২য় চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ১৫)।

এখানে ল্যাম্বরন বর্ণিত "শেরশাবাদী" এবং কার্টার বর্ণিত "শেরশাবাদিয়া"কে "distorted forms" বা বিকৃত রূপ বলেছেন গবেষক। অথচ গবেষক নিজেই পূর্ণিয়া গেজেটে (১৯৬৩) বর্ণিত নাম "শেরশাবাদিয়া"কে বিকৃত করে "শেরশাহাবাদিয়া" লিখেছেন। সুতরাং যিনি অন্যের কথাকে বিকৃত করছেন, তিনি আবার দাবী করছেন যে অন্যদের লিখিত নামগুলোই বিকৃত।

গবেষকের এটি একটি পরস্পরবিরোধী এবং ডাহা মিথ্যে কথা যে ব্রিটিশগণ "শের শাহ আবাদী" নামটি ব্যাবহার করেছেন "অফিসিয়্যাললি" ও "আনঅফিসিয়্যাললি":

> During colonial period, the name Sher Shah Abadi was applied by the British, both officially and unofficially. (২য় চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ২১)।

এমন কোনো ব্রিটীশ ডকুমেন্ট দেখাতে পারেন নি গবেষক যা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে ব্রিটিশগণ "শের শাহ আবাদী" নামটি ব্যাবহার করেছেন

"অফিসিয়্যাললি" ও "আনঅফিসিয়্যাললি"। বরং, কার্টারের নাম দিয়ে কীভাবে "শের শাহ আবাদী" শব্দটা চালানোর চেষ্টা করেছেন গবেষক, তা লক্ষ্য করুন:

> **As M. O. Carter maintains that - "The name (Sher Shah Abadi) is derived from Shershabad pargana...." (২য় চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ১৪)।**

কার্টার "শের শাহ আবাদী" কথাটি আদৌ লিখেন নি, বরং তিনি শেরশাবাদিয়া (Shersabadiya) শব্দটি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন।

উক্ত থিসিসে প্রায় ৮ বার সঠিক বানানে ল্যাম্বরণ-উল্লেখিত শেরশাবাদী (Shershabadi) শব্দটি লিখিত রয়েছে জনজাতির নামের বিভিন্ন প্রসঙ্গে। সে যাহোক, পরগণার নাম অখণ্ডভাবে শেরশাবাদ তথা শেরশাহাবাদ হতে সৃষ্ট জনজাতির নাম অখণ্ড শব্দে শেরশাবাদী বা শেরশাহাবাদী না লিখে আক্রামুল হক কেন বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত "শের শাহ আবাদী" শব্দটি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করলেন, তার কোনো সঠিক যুক্তি-প্রমাণ-ব্যাখা দেন নি তাঁর থিসিস বা নিবন্ধগুলির মধ্যে। এই সব ব্যাপারে পাঠকের সতর্ক থাকা জরুরী।

১০. 'শেরশাহ' থেকে 'শেরশাবাদিয়া'?: বিহার প্রেক্ষিৎ ও কাল্পনিক তত্ত্বের খণ্ডন

আলোচনার এই অংশের শিরোনামে বিহার প্রেক্ষিৎ এই জন্যই যে এখানে মূল আলচ্য গ্রন্থ্যটি হলো পি. সি. রায় চৌধুরী কর্তৃক রচিত *বিহার ডিস্ট্রিক গেজেটীয়ার্স: পূর্ণিয়া* (১৯৬৩)। এই গ্রন্থে উল্লেখিত "Shershabadia" জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন গবেষণা সহায়ক (Research Assistan) নিয়োগ করা হয়েছিল এবং মনিহারী ও বারারি থানার মোট পাঁচটি গ্রামকে এইসব তথ্য সংগ্রহের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল:

> **An investigation was made by a Research Assistant at villages Baidyanathpur, Peepertola, Dilarpur, Goaganchi (Manihari P.S.), Banka and Baretta (Barari P.S.) (পৃষ্ঠা ১৫১)।**

শেরশাবাদিয়াদের গোড়ার ইতিহাসকে জনশ্রুতির ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন করে লেখা হয়েছে: "কথিত আছে (It is said) যে শেরশাহ বাংলা জয় করার পর মালদহ ও মুর্শিদাবাদে তাঁর কিছু সৈন্যকে ছেড়ে এসেছিলন যারা পাঞ্জাবের দিক থেকে আগত। এই শ্রেণীর লোকদের শেরশাহের নামে নামকরণ হয় এবং এরা শেরশাবাদিয়া নামে পরিচিত হয়। কিছুকাল পরে এরা পূর্ণিয়া জেলায় আসে। এরা সবাই মুসলিম।":

> **<u>It is said that</u> Shershah after conquering Bengal left some of his army men who originally came from the Punjab side, at Murshidabad and Maldah. This class of people were named after Shershah and were known as Shershabadia. After some time some Shershabadias came over to Purnea district. They are all Muslims. (পৃষ্ঠা ১৫১)।**

শেরশাহের নামে শেরশাবাদিয়া নামকরণ এবং শেরশাহের সৈন্যদের সঙ্গে শেরশবাদিয়াদের সম্পর্ক -- এই কথিত কথা অর্থাৎ জনশ্রুতির উপর ভর করে তৈরি হওয়া গল্পের সত্যতা যাচ্ছাায়ের কোনো চেষ্টা করেন নি উক্ত রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট। এই কথিত কথাটি যে ভুল তা নিম্ন লিখিত কারণগুলিতে স্পষ্ট:

১. তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট কোনো ইতিহাসের হাওলা বা সূত্রের উল্লেখ করেন নি।

২. উক্ত রিসার্চ এসিট্যান্ট জি. ই. ল্যাম্বর্ণের লেখা ১৯১৮ সালের মালদা গেজেটীয়ার এবং এম. ও. কার্টারের ১৯৩৮ সালের লেখা মালদা জেলার "সার্ভে এণ্ড সেটেল্মেন্ট রিপোর্ট" পড়েন নি; উক্ত গ্রন্থদুটি পড়া থাকলে, অবশ্যই তিনি উল্লেখ করতেন যে শেরশাবাদ পরগণার নাম থেকেই শেরশাবাদিয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং 'শেরশাহ' থেকে 'শেরশাবাদিয়া' নামসৃষ্টির কথিত তত্বকে গুরুত্ব দিতেন না।

৩. উক্ত রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট ফ্রান্সিস বুকাননের লেখা *An Account of the District of Purnea in 1909-10* বইটিও পড়েছেন কি না যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বইটি পড়া থাকলে অন্তত্ব এটা স্বীকার করতেন যে ১৮১৩ সালে মালদহ জেলা গঠনের আগে শেরশাবাদ পরগণা পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ১ম নম্বর পরগণা ছিল এবং সেইসুত্রে শেরশাবাদিয়াগণ পূর্ণিয়া জেলার ভূমিপুত্র ছিল। শতাব্দী কাল ধরে পূর্ণিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্বেও আলোচ্য গেজেটীয়ারে শেরশাবাদিয়াদের সম্পর্কে এক ঘৃণ্য মিথ্যা ইতিহাস তৈরীর চেষ্টা করে লেখা হলো: "মালদহের দিক থেকে আসা এরা পরিযায়ী (migrant) শ্রেণী, মনে করা হয় যে এদের কোনো ডর-ভয় নেই এবং সামান্য কারণে খুন করতে পটু। নদীসমূহের ধার বরাবর এদের কলোনী রয়েছে মনিহারী, কাটিহার এবং অন্যান্য জায়গায়। ওরা অন্যের জমি চাষ করে, কিন্তু কোনো ভাড়া (Rent) দেয়না; আবার চাপ দিলে ওরা একসঙ্গে (en-mass) ভাড়া না চুকিয়ে অনত্র কেটে পড়ে।" (পৃষ্ঠা ৫৩১):

> "Shershabadias, a class of migrant Muslims from Maldah side, are usually taken to be fearless people who would not refrain from committing even murder if necessary. Usually they settled down on the side of the rivers and there are large colonies of Shershabadias at Manihari and Katihar and other areas. They take lands from others but usually would not pay any rent, but if any pressure is put on them they migrate en-masse elsewhere." (পৃষ্ঠা ৫৩১)।

৪. শেরশাবাদিয়াদে সঙ্গে শেরশাহের সৈন্যদের কাল্পনিক যোগ তৈরি এবং পাকিস্তান থেকে তাদের আগমন হওয়ার গল্প তৈরির মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের একটা যোগ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে, অথচ

শেরশাহের যুগে বা মুঘল ও ব্রিটিশ যুগে পাকিস্তান নামটাই ছিল না। পাকিস্তান শব্দটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঢুকিয়েছেন উক্ত রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট:

Generally these people are six to seven feet tall and have got well-built physique in contrast to the physique of the average Musims of Purnia. They are very hardy and strong. From this it appears that they may have originally come from East Punjab and West Pakistan. (পৃষ্ঠা ১৫১)।র

৫. উক্ত গেজেটীয়ারে, পাঞ্জাব তথা পাকিস্তানের লোকদের মতো শেরশাবাদিয়াদের উচ্চতা ৬/৭ ফুট বর্ণনাটি সত্যি অতিরঞ্জিত। শেরশাবাদিয়াদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মানুষ ৬/৭ ফুট উচ্চতার দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ শেরশাবাদিয়া পুরুষ এবং নারীর উচ্চতা যথাক্রমে ৫.৫-৬.০ ফুট এবং ৫.০-৫.৫ ফুট। কোনো কোনো শেরশাবাদিয়া ব্যাক্তি সুপ্ত বর্ণবাদী মানসিকতার কারণে পূর্ণিয়া গেজেটীয়ারের বর্ণনাতে তৃপ্তি অনুভব করেন এবং সৈয়দ-মোগল-পাঠান-সেখ (যেমন ব্রাহ্মন-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শুদ্র) নামক বর্ণস্তরে নিম্নস্তরীয় সেখ অবস্থান থেকে একধাপ উপরে উঠে গিয়ে নিজেকে পাঠান রূপে দেখানোর এক অস্ত্র খুঁজে পান। অথচ এই কাল্পনিক অস্ত্রের আবিষ্কার করা হয়েছে শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠিকে বদনাম করার জন্যে। এই গেজেটীয়ারে শেরশাবাদিয়াদের শারীরিক উচ্চতা 'ছ-সাত' ফুট বলা এবং তাদের শরীর 'সুঠাম' (well-built physique) তথা "শক্ত ও সবল" (hardy and strong) বলাটা কোনো প্রশংসার জন্য নয়, বরং পৌরানিক কায়দায় কথিতরূপে (it is said) তাদের আসুরিক রূপে এবং অপরাধী সম্প্রদায় হিসাবে সাজানো হয়েছে ঠিক পরের বাক্যটিতে:

<u>It is said that</u> they are generally of variable temperament and may even commit murder on slightest provocation. From the records of the local police-stations of Manihari and Barari thanas, it appears that there are a number of criminals among the Shershabadias. The thanas maintain list of criminals for this community. [অর্থাৎ "কথিত আছে, এরা বদ মেজাজী এবং এরা সামান্য কারণেই মানুষকে খুন করে। মনিহারী ও বারারী থানার রেকর্ডে শেরশাবাদিয়া অপরাধীদের একটা সংখ্যা পরিলক্ষিত এবং এই সম্প্রদায়ের অপরাধীদের জন্য আলাদা লিস্ট বা রেকর্ড-বহি আছে"] (পৃষ্ঠা ১৫১)।

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে শেরশাবাদিয়াদের কলঙ্কিত করা হয়েছে আর শেরশাহের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের সম্পর্কের গল্প ফেঁদে শেরশাহের ইতিহাসকেও কলঙ্কিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য গেজেটীয়ারের প্রথম দিকে এবং শেষের দিকে এদেরকে অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। অনেকটা পুরাণে যেমন রাক্ষসদের সম্পর্কে বর্ণনা থাকে সেইরকম কিছু লেখা হয়েছে গেজেটীয়ারের ১৩ পৃষ্ঠায় যার বর্ণনা বাংলায় অনুবাদ করলাম পাঠকের সুবিধার জন্য:

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশক পর্যন্ত পূর্ণিয়া জেলার সীমান্ত (borders) এলাকায় ফাঁকা স্থানসমূহ (no man's land) শেরশাবাদিয়া গোষ্ঠীগুলোর (gangs) কর্মকাণ্ডের জন্য কুখ্যাত (notorious) ছিল। এই সব এলাকায় এদের দল বেঁধে ডাকাতি করা ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। এইসব কারণে একটা দুই লাইনের প্রবাদ চালু হয়েছিল, "যদি তুমি মরতে চাও, তোমার বিষ খাওয়ার প্রয়োজন নেই / শুধু পূর্ণিয়াতে যাও, তাহলেই তুমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎ দেখতে পাবে"। অনেকের কাছে পূর্ণিয়া ছিল একটা সন্ত্রাস (terror)-এর নাম যেমন নেপালের মোরাং এলাকাকে একটা শাস্তির এলাকা (penal area) মনে করা হতো। পূর্ণিয়ায় কোনো অফিসারের বদলি (transfer) হলে এটাকে সেই অফিসারের একটা দুর্ভাগ্য এবং একটা শাস্তি ভাবা হতো। পূর্ণিয়ার আবহাওয়া ও সাস্থ্য (climate and health) বাজে ছিল এবং ১৯৩৪ সালের বড় ভুকম্পের পরে (পরিবেশের) বড় পরিবর্তন হলেও এখনো লোকে পূর্ণিয়া যেতে ভয় করে, বিশেষ করে ছোট নাগপুর এবং দক্ষিণ বিহার জেলার মানুষের ভিতর থেকে সেই ভয় দূর হয় নি। (পৃষ্ঠা ১৩)

এই বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার যে শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়কে একটা সন্ত্রাসী (terror) সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং এদের কারণে নাকি বিহারের অন্য জেলার মানুষ (বিশেষ করে ছোটো-নাগপুর ও সাউথ-বিহার জেলার লোকেরা) ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। এই সম্প্রদায়কে খারাপ আবহাওয়া এবং অসাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাদের ঠেকাতে যেন ঈশ্বর ভুমিকম্প পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে এদের ঘর-বাড়িকে জুড়ে দিয়ে অন্য এক পৃষ্ঠায় লেখা হলো:

> They live in mud and thatched houses which are made of bamboo and straws. The houses are rather dirty and there is not much attention to sanitation. (পৃষ্ঠায় ১৫২)।

আমরা জানি যে শেরশাবাদিয়াদের গ্রামগুলো বাঁশঝাড়া এবং গাছপালা ঘেরা, বিশেষ করে গ্রামের পেছন দিক। স্বাভাবিকভাবে অক্সিজেনযুক্ত ছায়াঘেরা সুস্থ আবহাওয়ায় এরা বসবাস করে। এরা সকাল বিকাল দুবার ঘর-দুয়ার-আঙিনা, গোয়াল-ঘর এবং বাড়ির সামনের গলি ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার রাখে। অথচ এদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে এদের ঘর-বাড়িকে 'dirty' বা নোংরা বলা হলো উক্ত গেজেটীয়ারে। শেরশাবাদিয়ারা কৃষিকাজে যুক্ত থাকায় বাড়িতে গোরু-মোষ পালন করে। এরা গোয়াল-ঘর সাফ করে গোবর দিয়ে গোবরের ঘুঁটে (ঘুসি, চেপড়ি ও নোন্দা) শুকিয়ে জ্বালানি করে। বাড়ির সামনে গোবর ও আবর্জনা রাখার মাইন্দ থাকে। এ সব কারণে বাড়ীর সম্মুখের সৌন্দর্য থাকে না। তার মানে এই নয় যে এদের বাড়িঘর নোংরা (dirty)। সেই যুগে বাড়িতে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে

বেশিরভাগ গ্রামে শৌচালয় (toilet) ছিল না এবং খালের ধারে ও মাঠে পায়খানা করা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র শেরশাবাদিয়াদের সম্পর্কে একথা বলা এক ধরণের ঘৃণা-বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নয় যে "ওরা স্বাস্থ্যবিধি (sanitation) মানে না" (পৃষ্ঠা ১৫২)। বরং অন্য জায়গায় যখন গেজেটীয়ারে শেরশাবাদিয়াদের বলা হচ্ছে যে ওদের স্বাস্থ্য "hardy and strong" বা "শক্ত ও সবল" (পৃষ্ঠা ১৫১), তখন তাদের "নোংরা (dirty)" থাকার এবং "সাস্থ্যবিধি না মানা"র মিথ্যে গল্পটা আপনা-আপনি ধরা পড়ছে।

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমাটি তৎকালীন পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত (পৃষ্ঠা ১১০)। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর ছিল ইসলামপুর। এখানে উর্দুভাষী ও সুর্জাপুরী মুসলিমগণের অধিবাস থাকা সত্তেও শুধুমাত্র শেরশাবাদিয়াদের কথা উল্লেখ করে বিশেষ উদ্দেশ্যে গেজেটীয়ারে বলা হয়েছে: "The portion of Kishanganj subdivision which has now gone to West Bengal has got a large number of Shershabadias" (পৃষ্ঠা ৫৩১) । এর মধ্য দিয়ে একটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে জিনিষ-পত্র এবং গবাদি পশু পাকিস্তানে পাচার করার অপরাধের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের একটা যোগ ছিলো : "Till recently this district was on the border of East Pakistan as well and afforded opportunities for smuggling of goods without paying customs. … Cattle were in great demand in Pakistan a few years before and cattle lifting was a very common offence in areas of this district which bordered East Pakistan." (পৃষ্ঠা ৫৩২)। আবার পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর ডাকাতির ঘটনাসমূহকে (a very hight incidence of dacoity) সুক্ষ্ম ইঙ্গিতে শেরশাবাদিয়াদের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হলো: "A few years before there was a very high incidence of dacoity in Pak-border areas of this district and the situation was brought under control after careful guarding of the border after mobilising Police Force and Bihar Military Police personnels" (পৃষ্ঠা ৫৫২)।

এমন নয় যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের সময় হতে পূর্ণিয়ায় ডাকাত (robbers) শুধু শেরশাবাদিয়া মুসলিমদের মধ্যেই ছিলো। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে মজনু শাহের নেতৃত্বের কথা আমরা জানি। দিনাজপুরের হেমতাবাদে কিছুকাল ছিলেন মজনু শাহ। মনে রাখা দরকার যে, ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের অংশ হিসেবে মুসলিম ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীরাও লুটপাটের ঘটনা ঘটাতো। ফকির ও সন্ন্যাসীরা বাংলার নবাবদের নিকট থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়ে তারা মুক্তভাবে ভ্রমণ করতো এবং বিভিন্ন মঠ-মন্দির-খানকাহ-মাদ্রাসাকে ঘিরে করমুক্ত জমিজায়গা থেকে তারা উপকৃত হতো। ১৭৫৭ সালে সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর ঈস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি এই সব সুবিধা খতম করলে সন্ন্যাসী-ফকিরগণ লড়াই শুরু করে (Amrita Sengupta, "Sannyasi Fakir Rebellion,

1770-1800: A Study in Overt Form of Rebellion," ***NSOU-OPEN JOURNAL*****, Vol.3 No.2, 2020)। আবার ১৮৫৭ সালের দিকে ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে শেরশাবাদিয়াদের একটা অংশ ব্রিটিশ বিরোধী কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে।**

বলা বাহুল্য ব্রিটিশ-বিরোধী সন্ন্যাসী-ফকির-শেরশাবাদিয়া বিদ্রোহের অন্যতম এলাকা ছিল পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ। সুতরাং ব্রিটিশ যুগে এদের কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকেই পূর্ণিয়া জেলায় এই ধরণের সন্ন্যাসী এবং শেরশাবাদিয়া কর্মকাণ্ড ছিল; পূর্ণিয়া জেলার উত্তরাংশে তরাই এবং নেপালের মোরাং এলাকার ঘন জঙ্গল এলাকা ছিল এদের আশ্রয় স্থল। এটা নিয়ে নেপালের রাজা এবং ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষোভ ছিল (পৃষ্ঠা ১৩)। কিন্তু, এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে পূর্ণিয়া গেজেটে দ্বিচারিতাপূর্ণভাবে সন্ন্যাসী ডাকাত ও শেরশাবাদিয়াদের দুই রকম শব্দ-প্রয়োগে বিচার করা হয়েছে। ডাকাতি (robbery)-এর ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের জন্য বলা হয়েছে "the predatory troups of Sannyasis," কিন্তু, শেরশাবাদিয়াদের জন্য লেখা হলো "notorious for the operations of the Shershabadia gangs" এবং "Gang dacoities have been common in such areas." (পৃষ্ঠা ১৩)।

উক্ত গেজেটীয়ারের ১২তম অধ্যায়ে "Law, Order and Justice" শিরোনামে লেখা হয়েছে যার বাংলা তর্জমা হল:

> *পূর্ণিয়া জেলায় অপরাধের অধিক্যের কারণ জেলাটির ভৌগলিক অবস্থান এবং লোকের চরিত্রকে। এখানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত জেলাটি ম্যালেরিয়া রোগের জন্য কুখ্যাত ছিল এবং এই রোগ মানুষের জীবনীশক্তি এমন ভাবে শুষে নিয়েছিল যে লোকজন অলস হয়ে পড়েছিল তথা ভারী কাজকর্মে এবং অপরাধ দমনে অক্ষম হয়ে গিয়েছিল। স্যাঁতস্যাঁতে জলবায়ু, বেলে মাটি আর জলময় খালবিলের কারণে আর্থিক দারিদ্র মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল অপরাধের দিকে। এবং অপরাধ করার পর তারা সহজেই নেপাল-সংলগ্ন তরাইএর জঙ্গলে গা-ঢাকা দিতো।* (পৃষ্ঠা ৫৩১)
> *রাজ্যের মধ্যে সব থেকে বেশি মেলা (melas) সংগঠিত হতো পূর্ণিয়া জেলায় এবং এই মেলাগুলো ঘিরে ঠগবাজি, জুয়া, গবাদি পশু চুরি, ধর্ষণ, নারী অপহরণ, পকেটমারি, চুরি, খুন করে লুন্ঠন, পাচার এবং রাস্তায় ডাকাতি ছিল সাধারণ ব্যপার। (পৃষ্ঠা ৫৩২)*

এই সব অপরাধে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যেকার অপরাধীদের জাত-পরিচয় বা জনজাতিগুলোর নাম সে অর্থে উল্লেখিত হয়নি গেজেটিয়ারে। নাম নেয়া হয়েছে তিনটি যাযাবর সম্প্রদায়ের

যারা হলো নাত, গুলগুলিয়া এবং ইরানী (পৃষ্ঠা ৫৩১-৩২)। কিন্তু অপরাধী হিসাবে যাদের নাম বার বার নেয়া হল তারা হলো শেরশাবাদিয়া:

> *এই জেলায় যেহেতু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানববসতি এবং সেই তুলনায় খালি জমির সংখ্যা প্রচুর, সেই জন্য অন্য জায়গার শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী ও সাহসী লোকদের চাষাবাদে নিয়োগ করতো স্থানীয় লোকেরা। এই পরিযায়ী লোকদের ও শ্রমিকদের মধ্যেকার কিছু মানুষ বেশির ভাগ অপরাধের জন্য দায়ী ছিল। শেরশাবাদিয়াগণ হলো মালদহের দিক থেকে আসা মুসলিম পরিযায়ী শ্রেণী। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ওরা ডরভয়হীন লোক যারা প্রয়োজনে খুন করতে ছাড়েনা।"* **(পৃষ্ঠা ৫৩১**

বলা বাহুল্য, গেজেটীয়ারের উক্ত উক্তিতে বলা হলো "*এই জেলায় যেহেতু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানববসতি এবং সেই তুলনায় খালি জমির সংখ্যা প্রচুর ,"* **আবার ঠিক পরের পাতায় উল্টো কথা বলা হলো:**

> *বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা হতে শেরশাবাদিয়াগণের আগমন* **(immigration)**-*এর কারণে জনসংখ্যার হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়ায় জমিজায়গার অভাব দেখা দিয়েছে এবং পরিবার-পিছু জমির পরিমান ভীষণভাবে কমে গেছে। বেলে মাটির কারণে সাধরণভাবে ফসলোৎপাদন কমে গেছে এবং জনপ্রতি খাদ্যশস্য ও অর্থকরী পণ্যশস্যের উৎপাদনও কমে গেছে। এই ফসল-কড়ির কম উৎপাদনের কারণে মানুষ ক্রমশঃ দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছে আর দারিদ্র তাদের অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।* **(পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৩)**

এখানে পক্ষপাতী বিদ্বেষী বর্ণনা লক্ষণীয় যে কীভাবে স্থানীয় অন্য জনজাতির মানুষদের দারিদ্র এবং তাদের সেইজনিত অপরাধের কারণ হিসেবে শেরশবাদিয়াদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে । উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। শেরশাবাদিয়াদের কারণে জমিসঙ্কটের গল্পটা যে অতিরঞ্জিত সেটি বুঝা যায় গেজেটীয়ারের এই কথাটিতে, "The population is sparse in comparison to the area, land is easily available and the rent incidence is low" (পৃষ্ঠা ১২৩)। তাছাড়া জনসংখ্যার হঠাৎ বৃদ্ধির কারণ যে শেরশাবাদিয়ারা নয়, বরং দেশভাগের ফলে পাকিস্তান থেকে আগত রিফ্যুজিগণের কারণে হয়েছে, সেই চিত্রটি ধরা পড়েছে গেজেটীয়ারের প্রথম পাতায়:

> **The reasons for this heavy growth in the population are partly the influx of the displaced persons from the East Bengal (East Pakistan) and partly the changes in the geological conditions of the district, the changes in the beds of rivers Kosi and Kankai and the old beds now coming under cultivation and being inhabitable. (পৃষ্ঠা ১)**

উল্টোদিকে মুসলিমদের একটা অংশ যে (বর্তমান বাংলাদেশ সহ) পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, সেই তথ্যটি ধরা পড়েছে এই কথায়:

> **New problems were created with the partition of the country and the creation of Pakistan. A number ol Muslims from Purnea district for various reasons had migtand to Pakistan. There was a panic among both the communities for some months following the communal outburst in 1946. This tension received its peak after the paitition which encouraged the Muslims to migrate.** (পৃষ্ঠা ৪৬৩)

পাকিস্তান হতে শরণার্থীদের আগমনের ফলে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির চিত্রটি ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ধরা পড়েছে। অন্যথায় ১৯৫১, ১৯৪১ এবং ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, জেলার বাইরে থেকে মানুষের আগমন **(immigration)** উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে (পৃষ্ঠা ১২৪) । সুতরাং, ১৯৩১-১৯৬১ সালের মধ্যে হাজার হাজার শেরশাবাদিয়া মুসলিম শ্রেণীর কাটিহারে আগমনের এই গল্পটা যেন অতিরঞ্জিত মনে হচ্ছে: *"বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে হাজার হাজার শেরশাবাদী মুসলিম শ্রেণী কাটিহারের চারিদিকের গ্রামগুলিতে বসবাস শুরু করেছে"* (পৃষ্ঠা ৭২১)। বরং,উক্ত এলাকার বর্তমানে বয়স্ক মানুষদের কাছে খোঁজ খবর নিলে বুঝা যায় যে বেশিরভাগ শেরশাবাদিয়াগণ শতাব্দীকাল ধরে অবিভক্ত পূর্ণিয়া জেলায় বসবাস করে আসছে। আর বাকীদের অধিকাংশই মালদহ-মুর্শিদাবাদ হতে ১৯৩১ সালের আগেই এসেছিলো। ১৯০১, ১৯১১ এবং ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে জেলার বাইরে থেকে মানুষের আগমন **(immigration)** উল্লেখযোগ্যভাবে উর্দ্ধমুখী ছিলো; বহিরাগতরা বেশিরভাগই উত্তর বিহার ও দক্ষিন বিহার থেকে আসা মানুষ; এদের অধিকাংশই বিহারের চম্পারণ, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুঙ্গের এবং দ্বারভাঙ্গা থেকে আসা মানুষ; এবং মালদা থেকে আসা বহিরাগতের সংখ্যা ছিল সামান্য (পৃষ্ঠা ১২৩-২৪)। এই আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে আগে উদ্‌ধৃত এই অভিযোগটি অসত্য: *"বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা হতে শেরশাবাদিয়াগণের আগমন* ***(immigration)****-এর কারণে জনসংখ্যার হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়ায় জমিজায়গার অভাব দেখা দিয়েছে এবং পরিবার-পিছু জমির পরিমান ভীষণভাবে কমে গেছে"* (পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৩)। প্রকৃতপক্ষে, তুলনামুলকভাবে পূর্ণিয়া জেলায় বহির্গমন **(emigration)** ও বহিরাগমন **(immigration)** যে উল্লেখযোগ্য কিছু নয় সেটা ধরা পড়েছে বর্তমান গেজেটীয়ারের এই কথায়: **"Urbanisation has been going on at a rapid pace because a remarkable circumstance about Purnea district is the comparative absence of emigration and immigration"** (পৃষ্ঠা ৫৬৮)।

ল্যাম্বরনের মালদা গেজেটীয়ার (১৯১৮) থেকেও জানতে পারা যায়, মালদা জেলার রতুয়া থানার পশ্চিমে অবস্থিত পূর্ণিয়া জেলার খালি **(vacant)** চরগুলোতে মালদহের কিছু মানুষ চলে যায় [১৯৬৩ সালের লেখা পূর্ণিয়া গেজেটীয়ারের প্রায়

পঞ্চাশ বছর আগে|; পক্ষান্তরে, বিগত তিন দশকে মালদহ জেলার বরিন্দ এলাকায় বিহারের সাঁওতাল পরগণা থেকে মানুষের আগমন যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং ঠিক তেমনই বিহার থেকে চাকরি/কাজের সন্ধানে আসা বেশ কিছু সংখ্যার মানুষ মালদহের সব থানায় স্থায়ীভাবে থেকে গেছে, বিশেষ করে রতুয়া ও তুলশীহাটার পশ্চিমভাগে চাষবাসের জন্য (ল্যাম্বরণ, *মালদহ গেজেটীয়ার*, ১৯১৮, পৃষ্ঠা ২৬)। ১৯৫৩ সালে দিল্লী হতে প্রকাশিত এ. মিত্রের *Census of India 1951* (Vol. VI. Part IA) রিপোর্টে উল্লেখ আছে পূর্ণিয়া হতে বহু সংখ্যায় হিন্দুগণ মালদায় এসেছিলেন: *Malda has seen large immigrations of Hindus from Purnea, Shershabadia Muslms from Murshidabad, Santals from Santal Parganas, and Paliyas from Dinajpur and Bogura* (পৃষ্ঠা ৬৭)। কিন্তু, মালদহের কোনো গেজেটীয়ারেই বলা হয়নি যে বিহার থেকে আসা মানুষের কারণে মালদহবাসীদের জমিজায়গার সংকট হয়ে গেছে। সুতরাং শেরশাবাদিয়াগণের কারণে পূর্ণিয়া জেলায় জমিসংকটের গল্পটা বানানো হয়েছে।

শেরশাবাদিয়াগণ পরিযায়ী শ্রমিক (migrant labour), বেশিরভাগ অপরাধে তাদের যুক্ত থাকা, অন্যের জমি চাষ করে ভাড়া না দেওয়া, অল্পতে রেগে যাওয়া ও মানুষকে খুন করা, তাদের গ্রামগুলোকে কলোনী, তাদের বাড়িঘর নোংরা ও সাস্থ্যবিরোধী, তাদের জন্য জমিসংকট হওয়া ইত্যাদি নানা কথায় শেরশাবাদিয়াদের সম্পর্কে মিথ্যে ও অতিরঞ্জিত অভিযোগগুলি একধরণের জুলুম ছাড়া কিছুই নয়। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের সীপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে ওয়াহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটীশ-বিরোধী কাজে এই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ যুক্ত থাকা সত্বেও ব্রিটীশ আমলারা এই সম্প্রদায় সম্পর্কে সেইভাবে খারাপ কিছু বলেন নি যেইভাবে স্বাধীন ভারতে লিখিত পূর্ণিয়া গেজেটে এদেরকে কলঙ্কিত করা হলো।

বলা বাহুল্য, এই গেজেটে যখনই তাদের ব্যাপারে প্রশংসামূলক কিছু বলা হয়েছে, তখনই বর্ণনার অভিমুখ খারাপ কিছুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রশংসা করে এবং এদের চাষাবাদের কলাকৌশলের প্রশংসায় বলা হয়েছে:

১. Generally these people … have got well-built physique in contrast to the physique of the average Musims of Purnia. They are very hardy and strong. (পৃষ্ঠা ১৫১)।
২. They are very hardy agriculturists and can cultivate deserted lands (পৃষ্ঠা ১৫২)।
৩. Shershabadias … are usually taken to be fearless people … They are excellent farmers for reclaiming lands and they are good cultivators. (পৃষ্ঠা ৫৩১)।

আসল কথা হলো, পূর্ণিয়ার অন্যন্য জনজাতির লোকগুলো যখন ম্যালেরিয়া-জনিত কারণে নিস্তেজ ও অলস হয়ে কর্মহীন, দরিদ্র ও অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়েছিল (পৃষ্ঠা ৫৩১), তখন পূর্ণিয়া জেলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে শক্ত, সবল ও কর্মঠ শেরশাবাদিয়া চাষী ও শ্রমিকগণের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরী ছিল। পূর্ণিয়ার স্থানীয় অন্যন্য জনজাতির সম্পর্কে একই কথা প্রায় এক শতাব্দী আগে ব্রিটিশগণ লিখে গেছিলেন। ১৮৭২ সালে প্রকাশিত ও বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস থেকে প্রকাশিত *স্ট্যাটিস্টিক্স ওব দ্য লোয়ার প্রভিন্সেস ওব বেঙ্গল ফর ১৮৬৮-৬৯* গ্রন্থের সূত্রে পূর্ণিয়া গেজেটে বলা হয়েছে যে সেইযুগেও পূর্ণিয়ার লোকজন ম্যালেরিয়া-প্রবণ জলবায়ুর কারণে দুর্বল (weak) এবং জীবনীশক্তিহীন (devoid of stamina) ছিল (পৃষ্ঠা ৩)। এই কারণে জমির মালিক বা ভুস্বামীগণ তথা জমিদারগণ শেরশাবাদিয়া কৃষক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন, যেহেতু অনুর্বর জমিও তাদের হাতের স্পর্শে উর্বর হয়ে উঠতো, "They are very hardy agriculturists and can cultivate deserted lands" (পৃষ্ঠা ১৫২)। এই কারণে, ব্রিটিশ যুগে জমিদারগণের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছিল তারা; এ কথা বয়স্ক শেরশাবাদিয়া লোকদের মুখে এখনো শুনতে পাওয়া যায়। তারা যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগ থেকেই পূর্ণিয়া জেলায় ছিলো সে ঈঙ্গিত পাওয়া যায় কোম্পানির বিরোধিতায় সন্ন্যাসী (the predatory troups of Sanyasis) ও শেরশাবাদিয়াদের কার্যকলাপ (the operations of Shershabadia gangs) প্রসঙ্গ থেকেই (পৃষ্ঠা ১৩)।

শেরশাবাদিয়াগণের সম্পর্কে আরো একটা বাজে কথা লেখা হয়েছে আলোচ্য গেজেটীয়ারে:

> *নদীসমূহের ধার বরাবর এদের কলোনী রয়েছে মনিহারী, কাটিহার এবং অন্যান্য জায়গায়। ওরা অন্যের জমি চাষ করে, কিন্তু কোনো ভাড়া* (Rent) *দেয়না; আবার চাপ দিলে ওরা একসঙ্গে* (en-mass) *ভাড়া না চুকিয়ে অনত্র কেটে পড়ে* (৫৩১)।

এই সব বর্ণনা দিয়ে একটা ছাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে যে শেরশাবাদিয়ারা যেন পরিযায়ী ও জমিহীন যাযাবর। এইসব মিথ্যারোপ নস্যাৎ করা যায় গেজেটীয়ারের বর্ণনা থেকেই। এরাও যে জমির মালিক সে কথাই ধরা পড়েছে এখানে:

> Their main occupation is agriculture or selling labour. Some of them cultivate the land on bataidari. The Shershabadias of Baidyanathpur, Banka and Peepertola villages have more land. They give rupee one and one seer of any grain to the labourers who work in their fields. (পৃষ্ঠা ১৫২)।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, উপরে উল্লেখিত মণিহারি থানার বোয়ালিয়া পঞ্চায়েতের পিপড়তলা (Peepertola) গ্রামে আমার শ্বশুর মরহুম সেখ ইব্রাহিম মণ্ডলের (১৯৩৩-২০০৭) আদি বাড়ি। তিনি ছিলেন কাটিহার কোর্টের স্বনামধন্য প্রবীণ এডভকেট। তাঁর পিতা ছিলেন আলহাজ মহম্মদ আলি মণ্ডল (১৯০৫-১৯৮৬) এবং বোয়ালিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের দীর্ঘকালীন মুখিয়া বা প্রধান ছিলেন তিনি। তিনি প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমির মালিক ছিলেন যার মধ্যে পাঁচশো বিঘা জমি ডাঙা আর এক হাজার বিঘা গঙ্গার চর এলাকা। ঐ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা তাঁকেই মনে করা হয় এবং অন্য গ্রামবাসী তাঁরই ছত্রছায়ায় সেখানে বসবাস শুরু করেন। তাঁর জন্ম এবং আদি ভিটা ঐ জেলারই বারারী থানার সুখাসন গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন সুখাসন গ্রামের আলহাজ আবদুল মাজিদ এবং পেশায় একজন ছুতোর (carpenter)। এখান থেকেই বুঝতে পারা যায় যে শেরশাবাদিয়া গ্রামটি (সুখাসন) ১৯০৫ সালের আগে থেকেই ছিল। আলহাজ মহম্মদ আলি মণ্ডলের মতই একজন ব্যাক্তি ছিলেন বারারী থানার বাঙ্কা গ্রামের মহ. সিরাজুদ্দিন যার নাম এই গেজেটীয়ারে উল্লেখিত রয়েছে:

> It was learnt from Md. Seerajuddin of Banka village that the population of Shershabadia Muslims in Purnia district is about 7000 (পৃষ্ঠা ১৫১)।

কিন্তু, গ্রামের একজন কৃষিজীবী গৃহস্থ মানুষ মহ সিরাজুদ্দিন কোনো সরকারী অফিসারও ছিলেন না বা জনগণনার সঙ্গে যুক্ত কোনো মানুষ ছিলেন না; অথচ তাঁর সূত্রে পূর্ণিয়া জেলায় বসবাসকারী সব শেরশাবাদিয়াদের সংখ্যাকে মাত্র ৭০০০ (সাত হাজার) বলাটা উদ্দেশ্যপ্রণদিত এবং অধিকাংশ শেরশাবাদিয়াদের বহিরাগত প্রমাণের একটা দূরভিসন্ধি ছাড়া আর কী হতে পারে? এই আনঝাটকা সংখ্যাটি যে সত্য নয় তা গেজেটীয়ারে উল্লেখিত গবেষণা সহায়কের দেয়া তথ্য থেকেই বুঝা যায়, যেখানে মাত্র ৫ (পাঁচটি) গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ১৮০০ (৬০০+৫০০+৫০০+১০০+১০০) লেখা আছে:

> They [Shershabadias] are scattered all over this district, namely, at Baidyanathpur, Peepertola, Dilaipur, Amdabad, Goaganchi, Banka, Baretta, Meerkel and Saharia etc. The population of this caste at Baidyanathpur village is about 600, at Peepertola and Dilarpur is about 500 each, at Banka and Baretta about 100 each. (পৃষ্ঠা ১৫১)।

অর্থাৎ এই ধরণের আর মাত্র ১৫টি গ্রামের জনসংখ্যা যোগ করলেই ৭০০০ জনসংখ্যা হয়ে যেতে পারে। এখানে বলা হয়েছে যে শেরশাবাদিয়াগণ সমগ্র পূর্ণিয়া জেলায় রয়েছে (scattered all over this district)। অর্থাৎ, জেলার বিভিন্না প্রান্তে অবস্থিত সমস্ত শেরশাবাদিয়া গ্রামের হিসেব নিয়ে জনসংখ্যা বের করলে এক বিরাট সংখ্যা দাঁড়াতে পারতো। অথচ মাত্র ৫ (পাঁচটি) গ্রামের উপর সমীক্ষা

চালিয়ে একজন গ্রামবাসীর আন্দাজি কথাকে চালিয়ে দিয়ে সত্যের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে এই গেজেটীয়ারে।

আরো একটি মিথ্যে কথা লেখা আছে আলোচ্য গেজেটীয়ারে, সেটি হলো যে বিহারে শেরশাবাদিয়ারা নাকি শুধু পূর্ণিয়া জেলাতেই বাস করে, অন্য জেলাতে নেই: *"The Shershabadia Muslims are found only in Purnea district in Bihar"* (পৃষ্ঠা ১৫১)। অথচ, ঝাড়খণ্ড তখনও বিহারেরই অংশ ছিল এবং শতাব্দী প্রাচীন শেরশাবাদিয়া বহু গ্রাম তখনও সাহেবগঞ্জ এবং দুমকা জেলায় অবস্থান করছিল। তার অর্থ দাঁড়ায়, ১৯৬১ সালের সময় বিহারের সকল শেরশাবাদিয়াকে শুধু পূর্ণিয়ায় কুক্ষিগত বলা একটা মিথ্যাচার কিম্বা অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

শেরশাবাদিয়া ভাষা বাংলার একটি আঞ্চলিক রূপভেদ। অথচ শেরশাবাদিয়া জনজাতির মাতৃভাষা নাকি উর্দু – এমনই আজগুবি কথা গবেষণা সহায়কের জ্ঞানে ধরা পড়েছে:

> **Their mother-tongue is Urdu but they speak a sort of Bengali language fluently. Besides they speak Maithili and to some extent Bhojpuri also. Though the area is far from the Bhojpuri and Maithili-speaking areas, but some persons of Bhojpur and Maithili-speaking areas have migrated with Shershabadias; by living in contact with the Bhojpuri and Maithili-speaking they have learnt Bhojpuri and Maithili. (পৃষ্ঠা ১৫২)**

বরং এক ধরণের বিশেষ বাংলা উপভাষাই যে তাদের আসল বুলি এবং উর্দুকে তাদের মাতৃভাষা বলাটা যে একধরণের তথ্যবিকৃতি – সেইটি গেজেটীয়ারের অন্য পাতায় ধরা পড়েছে:

> **The Sirsabadia Muslims who live mostly in the villages on the banks of the river Ganga and in the Kishanganj subdivision have originally come from Maldah and Dinajpur districts of West Bengal and they continue to speak a peculiar dialect of Bengali. (পৃষ্ঠা ১৩১)**

আর এক অন্য পাতায় একই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, "তারা মিশ্র বাংলা উপভাষায় কথা বলে" (পৃষ্ঠা ৭২১)।

এদের শিক্ষাদীক্ষার সম্পর্কেও এই গেজেটীয়ারে বেঠিক কথা বলা হচ্ছে, "ওরা ছেলেপুলেদের স্কুলে পাঠায় না... যেমন (মণিহারীর) বৈদ্যনাথপুরে প্রায় ৬০০ মানুষের মধ্য মাত্র দুজন মাট্রিক (মাধ্যমিক) উত্তীর্ণ" (পৃষ্ঠা ১৫৩)। এখানে লক্ষণীয়, ১৯৬০ এর দিকে মনিহারীর মতন জায়গায় যেখানে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম, সেখানে একটি গ্রাম থেকে দুজন শেরশাবাদিয়া মাধ্যমিক পাশ করেছেন, তার মানে প্রাইমারী পাশ করা শিক্ষার্থী আরো অনেক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং শেরশাবাদিয়াদের সম্পর্কে এই বক্তব্যটা মিথ্যে: "They do not

send their children to school" (পৃষ্ঠা ১৫৩)। বলা বাহুল্য, আমার শ্বশুর এডভকেট সেখ ইব্রাহিম ১৯৫৪ সালে মণিহারী বি.পি.এস.পী. হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ একজন শেরশাবাদিয়া নাগরিক যাঁর জন্ম উক্ত গেজেটে উল্লেখিত পিপড়তলা গ্রামে এবং তিনি ১৯৬৪ সালে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন টি.এন.বি. ল কলেজ (ভাগলপুর) হতে ওয়াকলতিতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬১ সালের বিহারের *ডিস্ট্রীক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক ১১: পূর্ণিয়া* গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়, মনিহারী ব্লকের/থানার গ্রামাঞ্চলে ১৯৬১ সালে প্রাইমারী পাশ বেকারের সংখ্যা ছিল ১০ এবং ম্যাট্রিক পাশ বেকারের সংখ্যা ছিল ৯ জন (পৃষ্ঠা ৪৫); মোট ৬৮৪ জন ম্যাট্রিক পাশ ব্যাক্তির মধ্যে ১২৮ জন ছিল কৃষক এবং ৩ জন কৃষি-শ্রমিক (পৃষ্ঠা ৪২); ২২৬৯ প্রাইমারী পাশ ব্যাক্তির মধ্যে ৫৪৪ জন কৃষক এবং ৩৩ জন কৃষি-শ্রমিক (পৃষ্ঠা ৪২)। মাধ্যমিক পাশ করে সরকারী চাকরি না পাওয়া মানুষের একটা চিত্র এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে। সেই যুগে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকদের বেতন ছিল একজন সরকারি পিওন ও চৌকিদারের চেয়েও কম (পূর্ণিয়া গেজেটীয়ার, পৃষ্ঠা ৪৪৮)। ধনী গৃহস্থদের দাক্ষিণ্যে সংসার চলতো শিক্ষকদের। এই রকম পরিস্থিতিতে প্রাথমিক পাশ করার পর সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় পড়ানোর আগ্রহ পেত না গ্রামের অভিভাবকগণ। ১৯০৮ সালের দিকেও এই প্রবণতা ছিল। উক্ত গেজেটীয়ারে বলা হয়েছে, প্রাইমারী শিক্ষায় মুসলিমগণ হিন্দুদের সমকক্ষ ছিল, কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল (প্রাগু. পৃষ্ঠা ৬০৫)। দারিদ্র এবং হাতের কাছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবেই শেরশাবাদিয়াগণ তাদের ছেলেপিলেকে মাধ্যমিক স্কুলে পাঠাতে অনাগ্রহী ছিল। অন্যথায় বাচ্চাদের গ্রামের মক্তবে আরবী ও উর্দু পড়ানো ছিল এক রকম বাধ্যমূলক। সুতরাং এ কথা এক ধরনের বাড়াবাড়ি যে "They do not send their children to school"। অথচ, একই ক্ষেত্রে রাজবংশী (Rajbansi) অভিভাবকদের জন্য নরম ভাষায় দোষমুক্ত করে গেজেটীয়ারে লেখা হলো:

> The incidence ol literacy is extremely low. It is ascribed mostly to the absence of educational institutions and poverty of the Rajbansis. Recently the State Government have established some Primary, Middle and High schools in the midst of the habitation of Rajbansis and literacy is expected to improve. (পৃষ্ঠা ১৫৬)।

তাই বলা যায়, শেরশাবাদিয়াদের প্রায় সব ব্যাপারে ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা বৈমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যাচ্ছে গেজেটীয়ারের মধ্যে।

এই গেজেটীয়ারে শেরশাবাদিয়া সমাজের সাংস্কৃতি বিষয়ে যে সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সেগুলো হলো:

১. এরা নিজেদের সেখ মুসলিম হিসেবে দাবী করে।

২. চাষীরা রোদ-বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাতে বাঁশের তৈরী 'ছোপি' মাথায় পরে।

৩. পাত্র-পাত্রীর বিয়ে ঠিক হওয়ার আগে পাত্রপক্ষ পাত্রীকে যা দেওয়ার জন্য রাজি হয় তাকে "মাঙ্গনি" (mangni) বলা হয়। অনুরূপভাবে পাত্রকে যা দেওয়ার জন্য পাত্রীপক্ষ রাজি হয় তাকেও "মাঙ্গনি" বলে।

৪. বিয়ের তিনদিন আগে মেয়েরা গান
গায়।

৫. গায়ে হলুদ মাখানোর রীতি স্থানীয় হিন্দুদের নিকট থেকে ধার করা বলে মনে হয়।

৬. বিয়েতে পাত্রীকে বোরখা পরানো হয়, যদিও মুখ আংশিকভাবে খোলা থাকে।

৭. বিয়ের দিন পাত্রপক্ষ পাত্রীকে অলঙ্কার ও পোশাক প্রদান করে। সব ঠিক হয়ে গেলে পাত্রীকে দেওয়ার জন্য "মোহর" ঠিক করা হয়।

৮. ছেলেরা লুঙ্গি-কুর্তা পরে। কেউ কেউ ধূতি-কুর্তাও পরে যা ভারতের কোথাও দেখা যায় না।

৯. নারীরা বাঙালীদের মত শাড়ী পরে, ব্লাউজ ও সায়া পরে। ওরা মাথায় সিঁদুর (vermiion) লাগায় এবং ঘরে বা বাইরে বোরকা পরে না। বেঙ্গল থেকে আসার ছাপ তাদের পোশাকে-আশাকে দেখা যায়। সোনা ও রূপার গয়না পরে তারা। কানফুল, কমল, নাকচাবি/ নাকবালি/ নাকবাঞ্ছি, হার ও তাবিজ তাদের বিশেষ অলঙ্কার। ওরা পায়ের আঙুলে আঙটি পরেনা। ওরা সোনা ও কাঁচের চুরি পরে। (পৃষ্ঠা ১৫১-১৫৩)

এখানেও কয়েকটি জিনিষে শেরশাবাদিয়া সমাজ সম্পর্কে ভুল কথা বলা হয়েছে। যেমন, বিবাহিত শেরশাবাদিয়া মুসলিম নারীগণ সিঁদুর পরে -- এটা একটা চূড়ান্ত মিথ্যা কথা। আবার বিয়েতে গায়ে হলুদ মাখানোর রীতিকে স্থানীয় হিন্দুদের থেকে নেওয়া হয়েছে বলে ভাবছেন গেজেটীয়ার-লেখক। আসলে শেরশাবাদিয়াদের আদি বাসভূমি শেরশাবাদ পরগণা যা ১৮১৩ সাল পর্যন্ত পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং যা পরবর্তীতে মালদহ-মুর্শিদাবাদের অংশ হয়ে গেছে; এই পরগণায় তথা পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী সব শেরশাবাদিয়া সমাজে শত শত বছর ধ'রে বিয়েতে গায়ে হলদী দেওয়ার রীতি চলে আসছে; এটা পূর্ণিয়ার হিন্দু সমাজ থেকে নতুন করে শেরশাবাদিয়ারা নেয়নি। বলা বাহুল্য যে স্মরণাতীত কাল থেকেই শেরশাবাদিয়া সমাজে নারীগণ বাঙালী হিন্দুদের মত যেমন শাড়ী পরে আসছে, ঠিক তেমনই বিয়েতে হলদীর রীতি, পান-সুপারির ব্যবহার, বিয়ের গীত ইত্যাদি রীতিনীতি হয়তো বা তাদের হিন্দু পূর্বজদের থেকে পেয়েছে বহু শতাব্দী আগে।

১১. "শেরশাহবাদী/শেরশাহওয়াদী": ১৯৮০ সালে নতুন নাম সৃষ্টির বিহার প্রেক্ষিৎ

এটা পরিষ্কার যে "শেরশাবাদিয়া" শব্দটি কমপক্ষে ১৯০০ সালের আগে থেকেই আছে। কিন্তু, "শেরশাহবাদী"/ "শেরশাহওয়াদী" শব্দটির জন্ম হয়েছে ১৯৮০ সালে। এই শব্দটির জনক হলেন কাটিহারের মনিহারী বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মরহুম মুবারক হোসেন সাহেব। স্বাধীনতার পর হিন্দী-উর্দুর দাপটে বাংলাভাষী তথা শেরশাবাদিয়া সমাজ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বর্তমান বিহারে স্বাধীনতার সাক্ষী বয়স্ক শেরশাবাদিয়া প্রজন্মের অবসানের ফলে এবং "শেরশাবাদিয়া" শব্দটির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবহার না থাকায় শব্দটি বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়। টিকে থাকে ব্যাঙ্গাত্মক শব্দ পরিচয় 'বাদিয়া' তথা 'বেদিয়া'। এদিকে ১৯৭১-এর পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশী রিফিউজীদের একটা অংশ বিহারেও আশ্রয় নেয়। "হিন্দী-হিন্দু-হিন্দুস্তান" – এই স্লোগানের প্রচারকারীদের চক্ষুশুল হয়ে উঠে হিন্দী-বলয়ের বাঙালীগণ। আর.এস.এস. সহ গেরুয়া রাজনীতির উত্থানের ফলে বিহারের বাঙলাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসে দুর্দিন। হতদরিদ্র এই জনগোষ্ঠীকে বাঙলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রূপে হয়রানি করা হতে থাকে। এমনকি যারা মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন তাদের কাছ থেকে চাওয়া হয় ভারতীয় প্রমাণের কাগজ-পত্রাদি। এরা মালদা মুর্শিদাবাদে ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে আদি বাসস্থানের ডকুমেন্ট তথা প্রধান-বিডিওর সার্টিফিকেট। এদের মুক্তি দেওয়ার কেউ ছিলনা, এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে কাটিহার মণিহারীর বাসিন্দা তথা আরারিয়ার বাসমতিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষক মুবারক হুসেন ১৯৭৪ সালে "বেদিয়া এসোসিয়েশন" তৈরী করেন। কিন্তু, "বেদিয়া/বাদিয়া" শব্দটি যেহেতু অন্য কয়টি জনগোষ্ঠীর নাম, তাছাড়া যেহেতু এই শব্দটি এই বাঙলাভাষী মুসলিম জনগোষ্টীর জন্য ব্যাঙ্গাত্মক নাম, তাই একটি নতুন ভদ্রস্থ নামের ভাবনা শুরু হয়। এই জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক নাম "শেরশাবাদিয়া" বিস্মৃতির ধুলায় চাপা পড়ে গিয়েছিলো। ইতিহাস-বিমুখ হতদরিদ্র ও বিভ্রান্ত এই জনগোষ্ঠীর মগজে টিকে থাকে শুধু জনশ্রুতি যে তারা নাকি শেরশাহ শুরীর সৈন্যদের বংশধর। এই কাল্পনিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করে একটি নতুন নাম "শেরশাহবাদী" আবিস্কৃত হয়। এই নামেই মুবারক হুসেনের নেতৃত্বে ১৯৮০ সালে All Bihar Shershahbadi/ Shershawadi Association (ABSA) তৈরী হয়। শেরশাহকে এমনই বীর ও আদর্শ মহাপুরষ হিসাবে কল্পনা করা হয় যে কাটিহারের হাজীপুরে এই এসোসিয়েশনের নামে দুই বিঘা জমি ক্রয় করা হয় এবং শেরশাহের নামে Shershah Ideal High School তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যদিও সেটি এখনো বাস্তবে তৈরী হয়নি। বিহার-গৌরব সম্রাট শেরশাহকে যেহেতু বিহারের ইতিহাসে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বীর সম্রাট হিসাবে ভাবা হয় এবং শাহাবাদ জেলা তথা সাসারামে যেহেতু শেরশাহের ও তাঁর বংশের সমাধি ও সৌধসমূহ রয়েছে, সুতরাং "শেরশাহবাদী" শব্দের

মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীর বিহারীকরণের জন্য অনুকুল মনে করতে থাকে তাঁরা। বিহারের বাঙালী মুসলিমদের জন্য "শেরশাহবাদী" শব্দটি যে নতুন -- সেটি স্বীকার করে নিয়ে মুস্তাক আহমেদ নাদভী লিখছেন, "इसी परिदृश्य में मुबारक साहब ने इन्हें शेरशाहबादी का नाम दिया।" বক্তব্যটির অংশ-বিশেষ বাংলায় তর্জমা করা হলো:

> "তাদের এমন শব্দে ডাকা হতো যা গালিগালাজের সমতুল্য ছিল। ওদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হতো, ওদের নাগরিকতার উপর প্রশ্ন উঠানো হতো এবং তাদের ডর-ভয় দেখিয়ে রাখা হতো।... সামান্য খেতিবাড়ি আর দৈনিক মজদুরীর উপর জীবিকা নির্বাহকারী এই সব লাখ লাখ মানুষ ছিল ঘৃণার পাত্র। কেউ ছিল না তাদের হয়ে কথা বলার। এমন সময় মুবারক হুসেন মসীহা হয়ে এলেন, উচ্চশিক্ষা লাভ করলেন, রাজনীতি শুরু করলেন, কয়েকবার বিধায়ক হলেন, আন্দোলন শুরু করলেন, অল বিহার শেরশাহবাদী এসোসিয়েশন বানিয়ে লোকদের সংঘবদ্ধ করলেন, নিজ সম্প্রদায়কে শেরশাহবাদী নাম দিয়ে ভয়ের মহল থেকে বের করলেন, নাগরিকতার প্রশ্নকে নিরাধার প্রমাণ করলেন এবং সরকারী সংরক্ষণের ব্যবস্থার ক্ষেত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন।" (https://sadiquetaimi.blogspot.com/2017/12/blog-post_24.html)।

"শেরশাহবাদী" একটি নতুন আবিস্কৃত শব্দ। শেরশাহ+বাদী অর্থাৎ শেরশাহের 'বাদ' বা মতের অনুসারী। 'বাদ' সংস্কৃত শব্দের অর্থ অনুসরণ তথা মতবাদ বা আদর্শ যেমন,মার্ক্সবাদ থেকে মার্ক্সবাদী। শেরশাহের বিশেষ কোনো আদর্শ বা মতবাদ নেই; সুতরাং, যদি শেরশাহের "অনুসরণ" অর্থে "শেরশাহবাদ" শব্দটি নেওয়া হয়, তাহলে "শেরশাহবাদী" শব্দের অর্থ হয় "শেরশাহের অনুসরণকারী প্রজা তথা সৈন্য-সামন্ত"।

এই সব আলোচনার সারকথা হলো যেই গেজেটীয়ারে শেরশাবাদিয়া সমাজের সমকালীন চিত্রকে বিকৃত করে বা কিছু অসত্য ঢুকিয়ে পরিবেশন করা হলো, সেই গেজেটীয়ারে এই অনুমান-নির্ভর গল্প-কথাটি ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করা যায় না যে "শেরশাবাদিয়া" নামটি শেরশাহের ছেড়ে যাওয়া ও পাঞ্জাব থেকে আসা সৈন্যদের নাম ছিল যাদের বংশধর বর্তমান শেরশাবাদিয়াগণ।

১২. এনথ্রপলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ও বিহারের শেরশাবাদিয়া

বিহারে "শেরশাহবাদী" শব্দনাম দিয়ে ও.বি.সি. সংরক্ষণের ব্যাবস্থা হলেও আদি পরিচয় "শেরশাবাদিয়া" নামেই ভারত সরকারের এনথ্রপলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া *People of India* শিরোনামের গ্রন্থ-সিরিজে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি হলো কে. এস. সিঙের সম্পাদনায় ২০০৮ সালে সী-গাল বুকস (কোলকাতা) হতে

প্রকাশিত *People of India: Bihar Including Jharkhand* [Vol. XVI, Part 2]। গ্রন্থের একটি চ্যাপটারের শিরোনাম হলো "The Shershabadia" যা লিখেছেন বিপ্লব ভট্টাচার্য্য। এখানে শেরশাবাদিয়া জনজাতির যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তা পূর্ণিয়া গেজেট (১৯৬৩) কর্তৃক বর্ণিত ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক অপবাদ থেকে মুক্ত। এ দিক দিয়ে লেখক নিসন্দেহে ধন্যবাদের যোগ্য। এখানে শেরশাবাদিয়া সমাজ-সংস্কৃতির যে দিকগুলো আলোচনা হয়েছে সেগুলো হলো:

১. ***মাঙ্গনি (negotiated marriage)-এর মাধ্যমে বিয়ে-শাদী হয়, প্রয়জনে ঘটক (professional matchmaker)-এর সাহায্য নেওয়া হয়। পতি-পত্নীর কেউ মারা গেলে নতুন কারো সঙ্গে বিয়ে অনুমোদিত।তালাকের ঘটনা ঘটলে সন্তানদের দায়ভার পিতার উপর ন্যাস্ত হয়।* (পৃষ্ঠা ৮৭৬)**

কিন্তু, "তালাক শুধুমাত্র ছেলেরাই দিতে পারে" এমন কথা লিখলেও মেয়েরা যে 'খুলা'র মাধ্যমে তালাকদানের অধিকারী সেটার কথা লেখা হয় নি। আবার "বিবাহিত মহিলারা বিয়ের চিহ্ন স্বরূপ মাথায় সিঁদুর লাগায়" -- এ কথাটি ভীষণ অসত্য।

আবার বিয়েতে বরের তরফ থেকে কনেকে দেওয়া "মোহর" প্রসঙ্গটি বাদ গেছে আলোচনায়। এর পরিবর্তে একটি বাক্য লিখা হয়েছে যাতে যৌতুক বা পণপ্রথার ইঙ্গিত রয়েছে যা না লিখলেও চলতো: "They have a system of dowry in cash and kind" (পৃষ্ঠা ৮৭৬)।

২. **"গর্ভবতী মহিলাদের উপর অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, তাদের সমৃদ্ধ খাবার (rich food) দেয়া হয় না। তাদের খোলাচুলে রাতের বেলায় বের হতে দেওয়া হয় না" (পৃষ্ঠা ৮৭৬) । এ সব অপ্রাসঙ্গিক কথা সিঁদুর প্রসঙ্গের মতই শেরশাবাদিয়া সমাজের সঙ্গে সঙ্গত নয়। সম্ভবতঃ লেখক অন্য কোনো সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট শেরশাবাদিয়াদের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।**

৩. ***সন্তান হলে সন্তানের নাড়ী (umbilical cord) একজন দাগারিন (dagarin/ midwife)-কে দিয়ে কাটানো হয়। এই দাগারিন চামার সম্প্রদায়ের বা নিজ সম্প্রদায়ের কোনো মহিলা হয়। দাগারিন "নাক কান ফোকা" সম্পাদন করে এবং বিনময়ে টাকা বা অন্য কিছু দান করা হয়। একজন মৌলভী বাচ্চার কানে আজান দেয়। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা দেওয়া হয় ও নাম রাখা হয়, এবং পুত্রের জন্য দুটো ছাগল আর কন্যার জন্য একটা ছাগল কুরবানি (sacrifice) করা হয়।* (৮৭৬)**

কিন্তু, নবজাতের ডান কানে আজানের শব্দগুলো এবং বাম কানে একামতের শব্দগুলো নরম শব্দে বাড়ির যে কেউ উচ্চারণ করতে পারে এবং মসজিদে সশব্দে আজান দেওয়ার মত যে এটা নয় -- এ কথাটা লেখা হয়নি এখানে।

একটা ভুল সংস্কার শেরশাবাদিয়া সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে যার নাম 'ষষ্ঠী' অনুষ্ঠান: *সন্তান-জন্মের ষষ্ঠ (৬) দিনে পালন করা হয় এটি এবং পাড়ার লোকজন তথা আত্মীয় মহিলাদের নিমন্ত্রণ করা হয় এই দিন; এই দিন নাপিত এসে নবজাতকের নখ ও চুল কাটে* (পৃষ্ঠা ৮৭৬)। আসলে, শেরশাবাদিয়া সমাজে ষষ্ঠীর কোনো রীতি নেই; বরং আকিকার দিন অর্থাৎ সপ্তম দিনে একটি বা দুটি পশু জবাই করা হয়, সন্তানের মাথার চুল কাটা হয় এবং নাম রাখা হয়; এই দিনেই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে থাকে শেরশাবাদিয়াগণ।

৪. *ছেলেরা বড় হলে দুই থেকে আট বছর বয়সের মধ্যে সুন্নত (circumcision) করা হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রথম ঋতু বা মাসিকের সময় নামাজ থেকে বিরত থাকে এবং চার দিনের দিন গোসল করে নাপাকি থেকে মুক্ত হয়* (পৃষ্ঠা ৪৭৬-৭৭)। এখানেও ভুল রয়ে গেছে, কারণ শুধু প্রথম ঋতু নয়, বরং প্রত্যেক মাসিকের সময় নামাজ ও রোজা থেকে বিরত থাকতে হয় মহিলাদের; তাছাড়া, মাসিকের চতুর্থ দিনেই যে স্নান করে পবিত্র হবে তা নয়, বরং তার আগে বা পরেও যখনই রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তখনই ফরজ গোসল সেরে পবিত্র হয় নারীরা।

৫. *মৃতের শব কাফনে আচ্ছাদিত করে কবর দেওয়া হয়* (পৃষ্ঠা ৮৭৭)।

এখানে শবকে যে গোসল করিয়ে পরিস্কার করে কাফন পরানো হয়, সেটি লেখা হয়নি। তাছাড়া শেরশাবাদিয়াদের মধ্যে প্রচলিত নেই অথচ যে ভুল কথাগুলো লেখা হয়েছে তা হলো:

মৃতের কবরের মধ্যে কিছুটা লবন ছিটিয়ে দেয়া হয়, কবরের মধ্যে জলের পাত্র ও মেঝেতে বিছানোর কাপড় (mattress) রাখা হয়, মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে মৃতের বাড়িতে মাওলানা বা হাফিজ দিয়ে কুরআন-খানির 'কুল' (kul) অনুষ্ঠান করানো হয়, মৃত ব্যাক্তি জীবিত অবস্থায় ব্যবহার করতো এমন কিছু অন্ন ও জিনিষপত্র গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, সপ্তম দিনে কুরআনখানি করানো হয় এবং চল্লিশতম দিনে চাহালুম (chahalum) বা চল্লিশা পালন করা হয় (পৃষ্ঠা ৮৭৭) ।

আসলে এইসব বেদাতী সংস্কার শেরশাবাদিয়া সমাজের বৈশিষ্ট নয়; বরং অন্য কোনো সম্প্রদায়ের এই সব রীতিনীতি জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলেই মনে হয়েছে।

৬. *তারা ধর্মীয়ভাবে সুন্নী এবং অন্যান্য উচ্চ মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। নিজেদের মধ্যে কোনো উঁচুনীচু শ্রেণীবিভাজন নেই। তাদের বংশ নির্দ্ধারিত হয় পিতার দিক দিয়ে। তাদের যৌথ ও একান্নবর্তী উভয় ধরণের পরিবার রয়েছে।* (পৃষ্ঠা ৮৭৬)

৭. *শেরশাবাদিয়াগণ আমিষ-ভোজী এবং গোমাংস খায়; ভাত ও ডাল তাদের প্রধান মেনু/খাদ্য* (পৃষ্ঠা ৮৭৬)। *অন্য সকল সম্প্রদায়ের নিকট হতে জলসহ কাঁচা, পাকা ও সিদ্ধ খাবার গ্রহণ করে অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা মানে না। অবশ্য উচ্চবর্ণের বিশেষ করে ব্রাহ্মনরা ওদের কোনো খাবার গ্রহণ করে না।* (পৃষ্ঠা ৮৭৭)

৮. **শেরশাবাদিগণ স্থায়ীভাবে কৃষিজীবী। অনেকে জমিহীন কৃষি-শ্রমিক। এদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের ঘটনা বাড়ছে।**

৯. *শেরশাবাদিয়ারা ইদানিং সন্তানদেরকে স্কুল-কলেজে পাঠাচ্ছে। ওরা আধুনিক স্বাস্থব্যাবস্থার সুবিধাগুলি গ্রহণ করছে। ওরা পরিবার পরিকল্পনাকে সমর্থন করছে। ওদের গ্রামে নলকুপ হতে পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। কর্মসংস্থানের প্রকল্পের আওতায় তাদেরকে নেওয়া হয়নি। বেশিরভাগ বাড়িতে রেডিও রয়েছে, কিন্তু টিভি নেই। তারা খবরের কাগজ পড়ে। তাদের গ্রামসমূহে যাওয়ার জন্য (পাকা) রোডের সংযোগ নেই। কাছেভিতে ডাকঘর আছে। কিন্তু গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয় নি।* (পৃষ্ঠা ৮৭৭)

উপরের ৬-৯ নং বিষয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব। লেখকের এ পর্যবেক্ষণ প্রশংসার দাবী রাখে। ১৯৬৩ সালের পূর্ণিয়া গেজেটের যে বিকৃত বর্ণনার দ্বারা শেরশাবাদিয়া জনজাতির ভাবমূর্তিকে নষ্ট করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ অনেকটাই হয়েছে ভারত সরকারের এনথ্রপলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের উদ্দ্যোগে প্রকাশিত ২০০৮ সালের এই গ্রন্থটিতে, যদিও 'শেরশাবাদিয়া' শব্দের উৎস নিয়ে বিহারে প্রচলিত লোকশ্রুতির উপরই নির্ভর করেছেন লেখক। বলা বাহুল্য, এই লেখার মধ্যে আগের কোনো গ্রন্থের রিফারেন্স উল্লেখ নেই।

'শেরশাবাদিয়া' নামের উৎস সম্পর্কে একটা নতুন থিওরীর অবতারণা করা হয়েছে নিবন্ধটিতে:

> **"Originally they lived in Murshidabad and Maldah districts of West Bengal. The origin of the term is Shersah-ne-abad-kia (rehabilitated by king Shersah). They speak Bengali among themselves and Hindi with others." (পৃষ্ঠা ৮৭৬)।**

"শেরশাহ-নে-আবাদ-কিয়া" – এই হিন্দী শব্দগুচ্ছকে 'শেরশাবাদিয়া' শব্দের উৎস বলা একটা নতুন তত্ত্ব বা থিওরী হতে পারে, কিন্তু, ইতিহাস হতে পারেনা। স্থাননাম শেরশাবাদ (পরগণা) থেকে যে শেরশাবাদিয়া শব্দটি এসেছে সেটা ল্যাম্বরণ (১৯১৮) এবং কার্টার (১৯৩৮) ব্যাখা করেছেন যার আলোচনা আমি নিবন্ধের প্রথম পর্যায়েই করেছি। এঁদের গ্রন্থদুটি না পড়ার কারণেই প্রচলিত লোক-ধারণার উপর ভর করেছেন আলোচ্য লেখক বিপ্লব ভট্টাচার্য্য।

১৩. শেরশাবাদিয়াগণের উৎস কি আরব দেশ? কাল্পনিক তত্ত্বের সমালোচনা

শেরশাবাদ পরগণার নাম থেকেই যে শেরশাবাদিয়া শব্দটি এসেছে সেটি মহ. আক্রামুল হক স্বীকার করেছেন তাঁর পিএচ.ডি. থিসিস *Influence of Arabic on the Bengali Dialect of Sher Shah Abadi Community* (২০১৫)-এর মধ্যে যার উল্লেখ এর আগে করেছি। কিন্তু শেরশাবাদিয়া জনজাতির উৎস ও উদ্ভব নিয়ে নতুন থিওরী পেশ করেছেন আক্রামুল হক যার সমালোচনা এখানে ভীষণ জরুরী।

শেরশাবাদিয়া বাংলা উপভাষায় কিছু আরবী শব্দের ব্যবহার থাকার কারণে শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি আরবদেশে হয়েছে এই ধরণের এক অদ্ভুৎ কাল্পনিক তত্ত্ব খাড়া করেছেন মহ. আক্রামুল হক তাঁর পি.এচ.ডি. থিসিসের মধ্যে: "The profuse use of Arabic words in their language is indicative of their Arab origin" (পৃষ্ঠা ৮)

সমালোচনা:

কোনো ভাষায় কিছু বিদেশী শব্দে উপস্থিত থাকালেই কি ধরে নেওয়া যায় যে সেই ভাষার মানুষগণ বিদেশ থেকে এসেছে? শেরশাবাদিয়া ভাষার চেয়ে বেশি হিন্দী/উর্দুতে আরবী শব্দ প্রবেশ করেছে। এটা থেকে কি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে উর্দু-হিন্দী-ভাষী জনগণের উৎস আরব দেশে রয়েছে? ঠিক একই ধরণের যুক্তিতে বলা যায় যে শেরশাবাদিয়া, বাংলা বা উর্দু/হিন্দীতে প্রচুর ফারসী শব্দ রয়েছে; তাহলে কি এই সব ভাষার মানুষগণ কি পারস্য (ইরান) থেকে এসেছে? ইদানিং ইংরেজী শব্দের আমদানি হয়েছে এই সব ভাষায়; তাহলে কি এমন কিছু বলা উচিৎ হবে যে এই সব ভাষার মানুষগণ ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে?

বাংলা তথা সমগ্র ভারত প্রায় আটশো বছর তুর্কী-আফগান-মুঘল শাসনকালে অফিসিয়্যাল ভাষা ফারসী থাকায় ভারতীয় তথা গৌড়বাংলার ভাষা সমূহে ফারসী ভাষার শব্দ ঢুকেছে। আর ফারসী ভাষার উপাদান হিসাবে আরবী শব্দও ঢুকেছে প্রচুর। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদীস আরবী হওয়ার কারণে পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষার মুসলমানদের মাতৃভাষায় আরবী শরিয়তী শব্দগুলো ঢুকেছে। তাই বলে এই সব আরবী শব্দের উপাদান কোনো অনারবীয় ভাষায় পাওয়া গেলে এমন কোনো সিদ্ধান্ত টানা পাগলামি ছাড়া কিছু নয় যে সেই মাতৃভাষার মানুষগণ আরব থেকে জাত। আফ্রিকার বেশ কয়টি দেশের ভাষা কালক্রমে আরবী হয়ে গেছে, এখান থেকে কি এটা বলা যায় যে আরবী ভাষী ঐসব কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো যেহেতু পুরোপুরি আরবী ভাষায় কথা বলে, সুতরাং

শেরশাবাদিয়া বাংলা উপভাষার মানুষদের থেকে তাদের দাবী বেশি যুক্তিযুক্ত যে তাদের উৎস আরব দেশ?

১৪. শেরশাবাদিয়াগণ কি নুরিস্তানী? এক কাল্পনিক তত্ত্বের সমালোচনা

দ্বিতীয় যে তত্ত্বটি মহ. আক্রামুল হক তাঁর পূর্বোক্ত থিসিসে খাড়া করেছেন সেটি হলো যে শেরশাবাদিয়াগণের পূর্বপুরষগণ নাকি নুরিস্তানী যারা আবার মনে করে যে তাদের পূর্বপুরুষগণ মক্কার কুরায়েশ বংশোজাত। নুরিস্তানীরা আরো মনে করে যে ওদের পূর্বপুরুষগণ নাকি মহম্মদ (স)-এর ভয়ে মক্কা বিজয়ের সময় ইরাকে পালিয়ে এসেছিল এবং তার পরে আফগানিস্তানের নুরিস্তানে বসবাস শুরু করে। পরে তারা মুসলমান তথা আহলে হাদীস হয়ে যায়। নুরিস্তানীদের এই লোকবিশ্বাস সম্পর্কিতা গল্পটি মহ. আক্রামুল হক যেখান থেকে নিয়েছেন সেটি হলো বাংলাদেশের হাদীস ফাউণ্ডেশন হতে প্রকাশিত এবং মহ. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের রচিত *আহলে হাদীস আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিৎ সহ* (২য় সংস্করণ) গ্রন্থ (পৃষ্ঠা ২৮৭, ৪৯৯; আক্রামুল পৃষ্ঠা ৮, ১৯) ।

সমালোচনা:

আহলে হাদীস আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিৎ সহ-- এই একটি মাত্র বই-এর উপর ভর করে আগে পিছে না ভেবে শুধু মাত্র একটা মিলকে [অর্থাৎ নুরিস্তানীগন ও শেরশাবাদিয়াগন উভয়ে আহলে হাদীস] খুঁজে নিয়ে নুরিস্তানীদের বংশধর হিসেবে শেরবাদিয়াদের দেখানোর চেস্টা করেছেন আক্রামুল (পৃষ্ঠা ২০-২১) । এই তত্ত্বের মধ্যে যে সব ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি প্রকট হয়ে উঠেছে সেগুলো হলো:

১. নুরিস্তানীদের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের সম্বন্ধ বিষয়টি না আসাদুল্লাহ আলগালিব তাঁর আহলে হাদীস আন্দোলন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন না অন্য কারো কোনো গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখিত আছে। অন্য কোনো গ্রন্থের রিফারেন্স আক্রামুল দেন নি। সুতরাং বিষয়টি আক্রামুলের মস্তিষ্ক-প্রসুত।

২. আফগানিস্তানের ইতিহাস গ্রন্থগুলো পড়া থাকলে আক্রামুল হক হরগিজ নুরিস্তানীদের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের সম্বন্ধ বানানোর কথা ভাবতেন না। আসল কথা হলো, ১৮৯৫ সালের আগে নুরিস্তানীগণ না মুসলমান ছিলেন, না আহলে হাদীস ছিলেন। এর আগে এদের রাজ্যটির নাম ছিল কাফিরিস্তান এবং এরা কাফির (অমুসলিম) নামে পরিচিত ছিল। এরা ধর্মীয়বাবে এনিমিস্ট তথা বহুইশ্বরবাদী প্যাগান ছিল:

> **These Kafirs, as the opprobrious name applied to them proves, were pagans. The beliefs were mingled with animism, but they recognized various gods, the chief of whom was Imra, the Creator. The Kafirs were forcibly converted to Islam by Amir Abdur Rahman, who renamed the country Nuristan or "Abode of Light." (Sir Percy Sykes, *A History of Afghanistan*, Vol. I, London: Macmillan, 1940, Page 10)**

আধুনিক আফগান জাতি তথা বর্তমান আফগানিস্তানের জনক আমির আব্দুর রহমান এদের বশে আনেন এবং ইসলামে দাখিল করান। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পে সমকালীন আফগানিস্তানের শাসক আমীর আবদু রহমানের কথা উল্লেখিত আছে। সে যা হোক, এদের মধ্যে লুটেরা ও ডাকাত ছিল সেটাও জানা যায় (প্রাগুক্ত পৃষ্টা ২৮১)। কেন আমির আবদুর রহমান শক্ত হাতে কাফিরিস্তানের কাফিরদের শক্ত হাতে দমন করেছিলেন তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই ঘটনায় যে তৃতীয় ঈঙ্গ-আফগান যুদ্ধে এই কাফিরগণ ইংরেজদের হয়ে লড়েছিল এবং আফগান গ্রামে লুণ্ঠন কার্য চালিয়েছিল (Geirge Macmunn, *Afghanistan from Darius to Amanullah*, London: G. Bell & Sons Ltd, 1929, pages 275-76)।

এরা অসংখ্য দেবদেবীসহ পূর্বপুরুষদের এবং আগুণের পূজো করে; এরা পৌত্তলিক; এদের প্রধান দেবতা সৃষ্টিকর্তা ইমরা এবং যুদ্ধের দেবতা গিশ; নানা উৎসবে নাচগানে মেতে ওঠে এরা; নারীদের কোনো স্থান এদের সমাজে নেই; নারীদের ভারবাহী পশুর মতোন এবং সন্তানপ্রসবকারী রূপে ভাবে এরা [W. K. Fraser-Tytler, *Afghanistan: A Study of Political Developments in Central and Southern Asia* (Second Edition), London: O. U. P., I953, Page 59]। কাফিরগণ ১৮৯০এর দশকে ইসলাম গ্রহণ করার আগে মদ উৎপাদন করতো। বর্তমানে এরা অর্থাৎ নুরিস্তানীদের কেউ কেউ আজও মদ তৈরি করে (Louis Dupree, *Afghanistan*, Princeton: Princeton University Press, 1980, Page 236)।

সে যা হোক, শেরশাবাদিয়াগণ ১৮৯৫ সালের বহু আগে থেকেই মুসলিম ছিল এবং বহু আগেই এদের মধ্যে বেশিরভাগ আহলে হাদীস হয়ে গেছিলো সেটা আমরা দেখেছি ডব্‌লু ডব্‌লু হান্টারের বর্ণিত মালদহের মুসলমান প্রসঙ্গে তাঁর ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত *A Statical Account of Bengal*, Vol. VII গ্রন্থে। যেহেতু শেরশাবাদিয়াগণের অধিকাংশই নুরিস্তানীদের চেয়ে অন্ততঃ ত্রিশ বছর আগে থেকে আহলে হাদীস তথা বহু যুগ বা শতাব্দী আগে থেকেই মুসলিম, সুতরাং কোনোভাবেই ইসলামের ধর্ম ও আহলে হাদীস মসলকের দৃষ্টিকোণ থেকে শেরশাবাদিয়াদের পূর্বজ হিসেবে নুরিস্তানীদের প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

৩. নুরিস্তানীদের ভাষার সম্বন্ধে আক্রামুল হকের কোনো ধারণা নেই সেটা তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়ে বলেন:

> Although it is not possible for us to undertake field work to know about the language of Nuristani people, because it is in foreign country but we have gathered secondary source of data about socio-cultural conditions of that particular area. (পৃষ্ঠা ১৯)।

সুতরাং তিনি নিজেও জানেন না যে নুরিস্তানী ভাষায় কতটুকু আরবী উপাদান রয়েছে এবং তাদের ভাষার সঙ্গে আরবী বা শেরশাবাদিয়া ভাষার

আদৌ কোনো সম্বন্ধ রয়েছে কিনা। সুতরাং আক্রামুলের তত্ত্বটা আপনা-আপনি ভিত্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ওয়েব-সাইট থেকে আমরা জানতে পারি, নুরিস্তানীদের ভাষা আরবী নয়, বরং ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীর একটি ভাষা:

Nuristani languages, group of six languages and several dialects that form a subset of the Indo-Aryan subdivision of the Indo-Iranian group of Indo-European languages. Nuristani languages are spoken by more than 100,000 people, predominantly in Afghanistan.
(https://www.britannica.com/topic/Nuristani-languages)

এখান থেকেও প্রমাণিত হলো যে, আরবী শব্দোপাদানের নিরিখে শেরশাবাদিয়াগণের সঙ্গে নুরিস্তানীদের বংশগত ও ভাষাগত কোনো সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া ভাষাগতভাবে উভয় গোষ্ঠী অনারবীয় -- অর্থাৎ আরবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের গল্পটা ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হচ্ছে না।

৪. নুরিস্তানীদের পূর্বপুরুষগণ আরবের কুরায়শগণ ছিল -- এই লোকবিশ্বাসটি তৈরী হয়েছে ১৮৯৫ সালের পরে। কাফির থাকা অবস্থায় তাদের নিজেদের উৎস সম্পর্কে অন্য ধারণা ছিল:

According to their own traditions they are the descendants of a once powerful people who came from the west. But the legends of their origin are too vague and too intermingled with fantasy to warrant serious consideration. Stories connect them, with Alexander, and there is a tale of a meeting between the Greeks of Alexander's army and a fair-skinned people who lived at a place called Nysa somewhere between the Kunar and the Indus. But these tales have no reliable basis. [W. K. Fraser-Tytler, *Afghanistan: A Study of Political Developments in Central and Southern Asia* (Second Edition), London: O. U. P., I953, Page 57].

এখানে দেখা যাচ্ছে কাফিরগণ (নুরিস্তানীগণ) নিজেদেরকে পাশ্চাত্য থেকে আসা এক শক্তিশালী জাতির বংশধর ভাবে; গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার এবং গ্রীক সৈন্যদেরদের সঙ্গে এই গল্পের সম্পর্ক স্থাপন করে তারা; কিন্তু এই গল্পগুলো তারা অতিকল্পনার ভিত্তিতে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে এগুলোর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে না (Kraser-Tytler পৃষ্ঠা ৫৭)।

লুইস দুপ্রী আফগানিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে এই নুরিস্তানী কাফিরদের প্রসঙ্গে বলেন:

The Kafirs (Edelberg, 1965) living near Nysa (not Swat as suggested by Tarn, 1962, 89) in Kunar (Koh-i-Mor, traditionally founded by Dionysius) sent 300 cavalry to fight with Alexander against Poros (the Paurava Rajah of the Punjab) whom Alexander defeated with great skill at the battle at the Jhelum

in 326 B.C. (Fuller, 1958). (Louis Dupree, *Afghanistan*, Princeton: Princeton University Press, 1980, Page 283)।

তার মানে হলো, ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ঝিলাম নদীর তীরে আলেকজান্ডার আর পুরুর মধ্যেকার যুদ্ধে কাফিরিস্তানের (বর্তমানে নুরিস্তানের) এই কাফিরগণের ৩০০ যোদ্ধা আলেকজান্ডারে পক্ষে লড়াই করেছিল; আমরা জানি, এই যুদ্ধে পুরু পরাজিত হোন এবং পৌরব রাজ্যটি গ্রীকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয় (লুইস দুপ্রী পৃষ্ঠা ২৮৩)

এখান থেকে জানা গেল যে মুহাম্মাদ (সা.)-এর মক্কাবিজয়ের প্রায় ৯৫৮ বছর পূর্বে এরা আফগানিস্তানেই ছিল। তার মানে এদের সঙ্গে কুরাইশদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং মহম্মদ (সা.)-এর ভয়ে মক্কা ছেড়ে ইরাক হয়ে এদের আফগানিস্তানে আসার গল্পটা চূরান্তভাবে মিথ্যা। নুরিস্তানীদের বনোয়াটী গল্প-বিশ্বাসের উপর ভর করে তাদের গল্পকে আহলে হাদীস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা এক মারাত্মক ভ্রমের। যে আহলে হাদীস সহীহ হাদীসকে মান্যতা দেয়, সেই আহলে হাদীস কেমন করে জয়ীফ-জাল লোকবিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে এক মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে -- তা ভাবতে অবাক লাগে। রাসুলের ভয়ে মক্কা ছেড়ে কুরাইশগণ আফগানিস্তানে পালিয়ে এসেছিল এবং ১৩০০ বছর পর মুসলমান হলো -- আরব ইতিহাসে এই রকম কথা আমি পাই নি এবং মহ. আক্রামুল হকও এই রকমের কোনো ইতিহাসের হাওলা দেন নি।

৫. আক্রামুল হক তাঁর থিসিসে শেরশাবাদিয়া ও নুরিস্তানী/ কাফিরিস্তানীদের বড় করতে কীভাবে এদের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেছেন এবং পাঠান, তুর্কী ও ইরানী/পার্শী ও আরো জাতিগুলোকে কীভাবে ছোটো করেছেন -- তা লক্ষ্য করুন:

“আরবের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের রক্ত-জিনের সম্বন্ধ (genetic infiltration) থাকার ফলে সহীহ সূত্রে পাওয়া ইসলামী নীতিকে গ্রহণ করার এক এতিহ্যময় মানসিকতা রয়েছে শেরশাবাদিয়াদের মধ্যে যা অন্যান্য আফগানী, ইরানী, তুর্কী ইত্যাদি মূল বা উৎস থেকে উদ্ভুত জনজাতিগুলোর মধ্যে নেই; অন্যান্য জনজাতিগুলোর লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মাযহাবী শির্ক ও বিদাত যুক্ত আমল বয়ে নিয়ে চলেছে যেহেতু তাদের সঠিক ইসলামী নীতিকে গ্রহণ করার মানসিকতা নেয়; অন্য দিকে সঠিক ইসালামী মৌলিক নীতিকে গ্রহণ করে নিজেদের সংশোধন করার মানসিকতা রয়েছে শেরশাবাদিয়াদের মধ্যে যা নুরিস্তানীদের মধ্যে পাওয়া যায়” (পৃষ্ঠা ৫৩)।

“শেরশাবাদিয়ারা পাঠান নয়, তারা আরবী কুরাইশজাত নুরিস্তানীদের বংশধর যারা সম্ভবতঃ গৌড় আক্রমণ করেছিল এবং সম্ভবতঃ শেরশাবাদ

পরগণায় বসতি গড়ে; তবে এই ঘটনার সত্যায়নে আরো গবেষণার দরকার” (পৃষ্টা ২১)।

সমালোচনা:

দ্বীন (ইমান ও ইসলাম) কি কখনো জেনেটিক হয়? দ্বীন কি জেনেটীকভাবে আসে? তা হলে আদম (আ)-এর ছেলে কাবিল কীভাবে ভ্রাতৃহত্যার পাপ করলো? কীভাবে নুহ (আ) -এর ছেলে কাফের হয়ে যায়? মুহাম্মাদ বিন আবদুল অহাব (১৭০৩-১৭৯২)-এর সংস্কার-আন্দোলন হওয়ার আগে কি কাবা শরীফে চার মাযহাবের চারটি আলাদা আলাদা আজান ও জামাত হতো না?; এবং কবরপূজা, চাদর চড়ানো ইত্যাদি কি চালু হয়ে হয়নি আরবে? নুরিস্তানীরা যদি জেনেটিক ভাবে দ্বীন-প্রবণ হয়, তাহলে রাসুলের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ বছর পর্যন্ত তারা কাফির অবস্থায় কী করে থাকলো? এমনকি আহলে হাদীস আন্দোলনের আগে যে শেরশাবাদিয়াগণ শির্ক ও বিদাতে লিপ্ত ছিল সেটি খোদ আক্রামুল স্বীকার করেছেন:

> **From the above description, it is easily presumed that before the middle of the 19th century the Sher Shah Abadis were indulged in many superstitions, Shrik and Bidat. Actually after the subdual of Wahabi Movement in 1871 the Sher Shah Abadis gave their identity as Ahle Hadeeth i.e. prophetic tradition. (Pages 49-50)**

বলা বাহুল্য, শেরশাবাদিয়াদের এখনো বহু গ্রাম তথা পাড়া রয়েছে যারা আহলে হাদীস মাসলাকের নয়, তারা এখনো হানাফী, এমনকি বেরেলভী মাসলাকের অনুসারী। আমাদের (ধানগাড়া বিষণপুর) অঞ্চলের নামো ধানগাড়ার শেরশাবাদিয়ারা বংশ পরম্পরায় হানাফী। সুতরাং শেরশাবাদিয়া ও নুরিস্তানীদের উদাহরণ দিয়ে তুর্কী, ইরানী, পাঠান ইত্যাদি জাতিকে ছোটো করা সমীচিন নয়। মাযহাবের উর্দ্ধে উঠে কুরআন ও সহীহ-সূত্রে পাওয়া সুন্নাহ/হাদীসকে শিরোধার্য করার মানসিকতা কমবেশি সবজাতির একটা অংশের মধ্যে রয়েছে। মালয়শিয়া, ইন্দেনেশিয়া, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে তো শেরশাবাদিয়া জনজাতি নেই -- তাহলে কি সহীহ হাদীস মানার মানসিকতা সম্পন্ন কোনো জামাত কি সেই সব জাতিগুলোর মধ্যে নেই। সুতরাং, শেরশাবাদিয়া ভাষায় আরবি শব্দের ব্যবহারের উপর গবেষণা করতে গিয়ে মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় এবং ভুল ধারণার অবতারণা থিসিসের গুণগত মানের সহায়ক নয়। জোর করে শেরশাবাদিয়াদের সঙ্গে মক্কার কুরায়শ বংশের সম্বন্ধ তৈরির কাল্পনিক প্রয়াসের দরকার আছে বলে মনে হয় না।

আক্রামুল তাঁর এই দুর্বল কাল্পনিক তত্বকে খাড়া করার জন্য যে সব সন্দেহ-সৃষ্টিকারী শব্দ ব্যাবহার করেছেন, সেগুলো হলো ‘supposed’ (যদি ধরে নওয়া

যায়), 'presumed' (এটা ভেবে নেওয়া বা অনুমান করা যেতে পারে), 'may/might be' (সম্ভাবনা এই যে) ইত্যাদি। এই সব কথা তাঁর বক্তব্যের ঐতিহাসিক তথ্যোপাদানের অনুপস্থিতিকেই প্রকট করছে এবং সেই জন্য তাঁর বক্তব্যের সত্যতা বিচার করতে আরো পড়াশোনার (study) দরকার বলে তিনি মনে করেন: "Further study needs to authenticate the fact" ((পৃষ্ঠা ২১)।

আসলে, "শেরশাবাদিয়া" নামে 'শেরশা' শব্দ থাকাই মনের মধ্যে শেরশাহের কল্পনা আসা স্বাভাবিক এবং সেখান থেকেই নিজের আইডেন্টিটিকে শেরশাহ কিম্বা তার সৈন্যদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপনের সুখ-কল্পনা থেকে জন্ম হয় এই ধরণের লোক-চর্চা, লোক-চর্চা থেকে লোকশ্রুতি। নিজেদের সাধারণ কৃষক-শ্রেণীর নিম্নস্তরীয় (সেখ স্তরীয়) মর্যাদা থেকে একটু উপরে উচ্চস্তরীয় পাঠান মর্যাদায় নিজেদের কল্পনা করার প্রবৃত্তি জেগে উঠে অবচেতন মনে। লোকচর্চা থেকে লোকশ্রুতি, লোক-শ্রুতি থেকে মিথ-মিথ্যা লোকবিশ্বাসের জন্ম হয়। নুরিস্তানী কাফিরগণ যারা এক সময় সম্রাট আলেকজান্ডারের গ্রীক সৈন্যদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতো, তারাই আবার মুসলিম হওয়ার পর নিজেদেরকে মুহাম্মাদের বংশের সঙ্গে যুক্ত করার লোকশ্রুতি তৈরি করে -- এটা উপরের গল্প থেকে জানতে পেরেছি। বিশেষ জনজাতির কোনো লেখকের মধ্যে এই আবেগ ও দুর্বলতা ঢুকে পরলে লোকশ্রুতিকেও সরাসরি ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। একই ঘটনা ঘটেছে মুহ. আক্রামুল হকের কলমে। তবুও, আক্রামুল হক থিওরী আকারেই রেখেছেন তার বক্তব্যকে, এই শব্দগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে: 'supposed' (যদি ধরে নওয়া যায়), 'presumed' (এটা ভেবে নেওয়া বা অনুমান করা যেতে পারে), 'may/might be' (সম্ভাবনা এই যে) ইত্যাদি।

৬. কেনো আক্রামুল বহুবচনে British surveyers লিখলেন এবং "almost confirmed" (প্রায় নিশ্চিৎ) শব্দ ব্যবহার করে সেই রিফারেন্সে একটা অসত্য তুলে ধরলেন, এটা তিনিই ভালো জানেন: "The British surveyors almost confirmed that the forefathers of Sher Shah Abadis came to Bengal from Afghanistan" [ব্রিটিশ সার্ভেকারীগণ প্রায় নিশ্চিৎ করেছেন যে শেরশাবাদিয়াগণের পূর্বপুরুষগণ আফগানিস্তান থেকে বেঙ্গলে এসেছিলেন] (পৃষ্ঠা ১৯)।

সমালোচনা:

কোনো ব্রিটিশ বলেন নি যে শেরশাবাদিয়ারা আফগানিস্তান থেকে এসেছেন। বরং শেরশাবাদিয়াদের উদ্ভব সম্পর্কিত থিওরী পেশ করতে গিয়ে একমাত্র ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট অফিসার এম. ও. কার্টারই লিখেছেন, "... it seems more likely that they are descendants of the army of Sher Shah, one of the Afghan

kings" ["এটা বেশি প্রতীয়মান হয় যে শেরশাবাদিয়াগণ শেরশাহের সৈন্যদের বংশধর"] (পৃষ্ঠা ৪৫)। এখানে আফগানিস্তান থেকে শেরশাবাদিয়াদের গল্পটা একদমই নাই। এমনকি শেরশাহও আফগানিস্তান থেকে আসেন নি। শেরশাহ একজন জন্মসূত্রে ভারতীয় তথা বিহারী; তাঁর জন্ম বিহারের সাসারামে ১৪৮৬ সালে এবং ১৫৪৫ সালে মৃত্যু হলে সেখানেই তাঁর দাফন হয়। সুতরাং তিনি বিদেশী নন বা জাতীয়তার বিচারে আফগান নন, যদিও তিনি পাস্তুন বা পাঠান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ঠাকুরদা ইব্রাহিম খান আফগানিস্তান থেকে এসে অধুনা হরিয়ানা রাজ্যের নারনৌলের জায়গীরদার বা জমিদার হয়েছিলেন। আর এম. ও. কার্টার এটাও বলেন নি যে শেরশাহ আফগানিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন।

১৫. শেরশাহের সৈন্য ও শেরশাবাদিয়া: এম. ও. কার্টারের তত্ত্ব-খণ্ডন

শেরশাবাদিয়া জনজাতির উদ্ভব নিয়ে কয়টি থিওরী চালু আছে সে কথা বলেছেন এম. ও. কার্টার: "There are several theories about their origin" (পৃষ্ঠা ৪৫):

১. একটি থিওরী হলো, *"It is said that a number of them were made prisoners .and forced to accept Islam"* *এরা ছিল মারাঠা যারা বাংলায় হানা দিয়েছিল এবং যাদের একটা অংশ বন্দী হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়* (পৃষ্ঠা ৪৫)।

২. *দ্বিতীয় থিওরীটি হলো এরা সম্রাট শেরশাহের সৈন্যদের বংশধর* (পৃষ্ঠা ৪৫)।

কার্টার প্রথম থিওরীটাকে এই বলে নাকচ করতে চাচ্ছেন যে, শেরশাবাদিয়াদের চেহারা মারাঠাদের মত নয় (পৃষ্ঠা ৪৫)। কিন্তু, শেরশাবাদিয়া ও মারাঠা -- এই দুই জাতির চেহারার বৈসাদৃশ্যগুলো কার্টার আলোচনা করেন নি; এর ফলে তাঁর এই নাকচ করাটা অযৌক্তিক মনে হচ্ছে।

আবার দ্বিতীয় থিওরীর প্রতি কার্টারের দুর্বলতা রয়েছে: অর্থাৎ "এটা মনে হচ্ছে যে তারা শেরশাহের সৈন্যদের বংশধর"। কিন্তু, তাঁর এই দুর্বলতার ফাঁক এবং এই থীওরিটার সারবত্তাহীনতা প্রকাশ পায় যখন তিনি বলেন:

> Whatever their origin may be, it is certainly not Bengali. They are for most part big men, of fine physique, with full black beards (unlike the rather straggly beards one generally sees) and with deepest eyes. (পৃষ্ঠা ৪৫)।

অর্থাৎ "এদের উদ্ভব-উৎস যা-ই হোক না কেন, এরা নিশ্চয় বাঙ্গালী নয়।" অর্থাৎ এদের উৎস নির্দিষ্ট কোনো কিছুতে অকাট্যভাবে স্থীর করতে পারছেন না কার্টার। কিন্তু কী ক'রে তিনি নিশ্চিৎ হলেন যে "এরা বাঙালী নয়"? এই প্রশ্ন আমরা সহজেই তুলতে পারি। কারণ, যারা শত শত বছর ধরে বাংলার মাটিতে বসবাস করছে এবং যাদের মাতৃভাষা বাংলারই এক রূপভেদ -- তারা বাঙালী না হলে আর

কাদের বাঙালী বলা যাবে? শেরশাবাদিয়াদের ও বাঙালীদের নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট কি সত্যি আলাদা? তিনি শেরশাবাদিয়াদের শরীরের বর্ণনা দিলেন এইভাবে:

> They are for most part big men, of fine physique, with full black beards (unlike the rather straggly beards one generally sees) and with deepest eyes. (পৃষ্ঠা ৪৫)।

“তারা বিশালদেহী মানুষ, তাদের গঠন সুন্দর, তাদের পূর্ণ কালো দাড়ি রয়েছে (পাতলা দাড়ি নয়) এবং গভীরতম চোখ”। কিন্তু, বাঙালীদের মধ্যে কি ঘন কালো দাড়ি হয় না? বাঙালীদের দাড়ি কি পাতলা এবং অন্য রঙের হয়? বাঙালীদের শরীরের গড়ন কি সুন্দর ও সুঠাম হয় না? সব শেরশাবাদিয়াই কি বিশালদেহী হয়? “গভীরতম চোখ” (deepest eyes) একটা অস্পষ্ট (vague) প্রকাশ। যেখানে বাঙালী ও শেরশাবাদিয়াদের পার্থক্যকারী বিশেষ কোনো নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য বলে কিছু নেই, সেখানে এই প্রশ্নগুলো বিচার করলে আমরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হবো যে কার্টারের কথাটি ঠিক নয়। বাঙালী এবং মুসলিম দুটি আলাদা আইডেন্টিটি – এই রূপে ভাবাটা একটা ভুল দৃষ্টিভঙ্গী কিম্বা ব্রিটিশ চাল্ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখনো পশ্চিমবঙ্গে কোনো কোনো সঙ্কীর্ণমনা অমুসলিম পাওয়া যায় যারা জানতে চায় “আপনি বাঙালী না মুসলিম”, কিন্তু কখনো বলবে না “আপনি হিন্দু না বাঙালী”।

কার্টারের দৃষ্টিতে বিহার থেকে আগত সাঁওতাল, মণ্ডল (সম্ভবতঃ চাঁই ও বিন) এবং মৈথিলদের মতোই হিন্দী মিশ্রিত বাংলা বলে মালদহের মুসলিমরা অর্থাৎ তারা প্রকৃত বাঙালী (Bengalis proper) নয়। শেরশাবাদিয়াদের ভাষাকেও একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন কার্টার:

> Among Muhammadans, Bengali, with a mixture of Hindi words, is spoken, and in the higher class families Urdu is often used. The Shersabadiyas have an intonation peculiar to themselves, the voice rising to a high pitch at the end of the sentence. This peculiarity is an unfailing source of satire at Gambhira and Alkap performance. (46)

> অর্থাৎ *মুসলিমগণ হিন্দী শব্দ মিশ্রিত বাংলা বলে এবং উচ্চ শ্রেণীর পরিবারে উর্দু ব্যবহৃত হয়। শেরশাবাদিয়াদের কথার সুরে তাদের এক অদ্ভুৎ নিজস্ব স্বরভঙ্গি রয়েছে আর বাক্যের শেষে উচ্চ স্বরটান থাকে। এই বিশেষত্ব গম্ভীরা এবং আলকাপ গানে ব্যাঙ্গরসের অব্যর্থ উৎস।* (পৃষ্ঠা ৪৬)

এখান থেকে এটা পরিস্কার যে, মালদহের মুসলিমদের ভাষাকে তিনি যতই হিন্দী-ঘেষা বলুন না কেন, এটা যে বাংলা ভাষারই ঐতিহ্য সেটা ধরা পড়েছে তাঁর স্বীকারোক্তিতে। সেটি হলো শেরশাবাদ পরগণার বিশেষ ঐতিহ্য গম্ভীরা ও আলকাপের লালনে শেরশাবাদিয়া ভাষার অশেষ অবদান রয়েছে। আর একটা বিষয় এখানে লুকিয়ে আছে, সেটা হলো গম্ভীরার নানা হলেন হিন্দু দেবতা শিব যাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্গ রসে সিক্ত করে সমাজের মন্দগুলোর সমালোচনা ও

ভালোগুলোর পক্ষে সওয়াল করেন গম্ভীরা শিল্পীগণ। শেরশাবাদিয়া ভাষার এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে হিন্দুদেরও একটা অবদান রয়েছে। বলা বাহুল্য, অবিভক্ত মালদা এবং মুর্শিদাবাদে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই প্রধান ভাষা শেরশাবাদিয়া যাকে স্বাধীনোত্তর কালে মালদাইয়া, জঙ্গীপুরী আর চাঁপাইয়া বলা হয়ে থাকে এলাকা ভেদে। শেরশাবাদিয়া ভাষা ও সংস্কৃতিতে গম্ভীরা, আলকাপ, গীদ, বিয়েতে হলুদ-অনুষ্ঠান ও পান-সুপারির ব্যবহার ইত্যাদি হিন্দু উপাদান প্রমাণ করেছে এরা যুগ যুগ শত শত বছর ধরে গৌড়বঙ্গে রয়েছে এবং এদের পূর্বজগণ বেশিরভাগই ধর্মান্তরিত।

তবে মালদহের মুসলিমদের একটা অংশ যে গৌড়বঙ্গের মাটিতে মিশে যাওয়া গৌড়-পাণ্ডুয়ার রাজা-বাদশাহদের বংশজগণ রয়েছে [largely descended from the conquerors of Gaur and Panduah] তার যুক্তি দিয়েছেন হান্টার (পৃষ্ঠা ৪৭)। আবার গৌড় বাঙলার রাজধানী হওয়ার সুবাদে বাইরে থেকে আসা বণিকগণ, সৈন্যসামন্তগণ এবং ধর্মপ্রচারকারী পীর-ওয়ালীগণ এখানে থেকে গিয়ে শেরশাবাদের মিলন-মোহনায় মিশে গিয়ে শেরশাবাদিয়া বাঙালি জনজাতিকে এক বিশেষ ছাঁচে ফেলেছে, সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় ল্যাম্বরণের কথায়, "...Mahomedans of the Shershabad pargana ... show traces descent from the foreign immigration of the time of the Mahomedan dynasties" (পৃষ্ঠা ২৭)। শেরশাবাদিয়া গ্রাম পীরগঞ্জ, কুতুবগঞ্জ, আলমপুর ইত্যাদি নামগুলো পাণ্ডুয়ার পীরদের স্মৃতি বহন করছে। সেই পীরদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা গনেশের পুত্র যদু হয়ে যান সুলতান জালালুদ্দিন। বিদেশ থেকে আগত শায়খ জালালুদ্দিন তাব্রিজীর সমাজসেবার ও মানবসেবার ধর্মে মুগ্ধ হয়ে কুলীন ব্রাহ্মন সেন রাজারা তাঁর মিশনকে সফল করার জন্য জমিদান করেন এবং তাঁর শানে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র "সেখ শুভোদয়া" সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এই রকম পরিস্থিতিতে হিন্দু বর্ণপ্রথায় কোণঠাসা নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ এবং নিপিড়ীত বৌদ্ধগণ দলে দলে মুসলমান হয়ে যান। এ ব্যাপারে গৌড়ে অবস্থিত সাদুল্লাহপুরের পিরাণে পীর উসমান আঁখি সিরাজের অবদান কম ছিলনা। গৌড়ের ছোটো সোনা মসজিদের সন্নিকটে ধর্মপ্রচারক সৈয়দ শাহ নিয়ামাতুল্লাহর এরকম মিশনকে সফল করার জন্য শেরশাবাদ পরগণার জমি দান করেছিলেন সম্রাট আওরঙজেব যা আগেই আলোচনা করেছি । শেরশাবাদিয়াদের পূর্বজদের ধর্মান্তকরণে এঁদের বিরাট ভূমিকা ছিল তা বলাই যায়।

অমর দত্ত তাঁর *উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ* (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০১) গ্রন্থে লিখেছেন, "মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধদের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে মুসলমানদের 'নেড়ে' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়" (পৃষ্ঠা ২)। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের মানুষরা এমনই অতিষ্ঠ হয়েছিল যে মুসলিম সুলতানদের মসীহারূপে

গ্রহণ করে এবং ধর্মঠাকুর যেন যবন বা মুসলমানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন (প্রগুক্ত পৃষ্ঠা ২)। লক্ষ্ণৌতি তথা গৌড়বঙ্গের তৎকালীন এই রকম প্রেক্ষিতে রামাই পণ্ডিত (খ্রী. ১৩শ/১৪শ শতাব্দী) তাঁর *শুন্য পুরাণে* "নিরঞ্জনের উষ্মা" কবিতায় লিখেছেন:

ধর্ম হৈল্যা যবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপী
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ ত্রীভুবনে লাগে ভএ
খোদায়ে বলিয়া এক নাম।

ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ব হৈল্যা শুলপাণি।
গণেশ হৈল গাজী কার্তিক হৈল কাজী
ফকির হৈল্যা জথমুনি।

গৌড়বাংলার এই সতস্ফুর্ত ধর্ম-পরিবর্তন না হলে রাজধানী গৌড়ে নবদ্বীপ থেকে কেন আসলেন শ্রীচৈতন্যদেব? ধর্ম-পরিবর্তনের এই স্রোত আঁটকাতে তিনি ইসলামের আদলে সব বর্ণের হিন্দুকে এক বরাবর করে ভক্তিধর্ম বৈষ্ণববাদের অবতারণা করেন। সারকথা, এই অঞ্চলে ইসলামী সাম্যবাদ ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হিন্দু-বৌদ্ধ পূর্বজগণই শেরশাবাদিয়া আইডেন্টিটির মুখ্য উৎস হিসেবে কাজ করছে। এই মধ্য বাংলার অন্যতম আদি বাসিন্দা শেরশাবাদিয়া সমাজ।

শেরশাবাদিয়া আইডেন্টিটি গঠণের আদিপর্বে গৌড়-পণ্ডয়ার শাসকগণ ছিলেন তুর্কী সুলতানগণ (১২০৩-১৪১৪ খ্রী.), ধর্মান্তরিত স্থানীয় রাজা/সুলতানগণ (১৪১৪-১৪৩৫), তুর্কী শাহী বংশ (১৪৩৫-১৪৮৭), আফ্রিকান (হাবসী) সুলতান (১৪৮৭-১৪৯৪), আরবী কুরাইশ বংশের সুলতান সৈয়দ হুসাইন শাহী বংশ (১৪৯৪-১৫৩৮), আফগান সুরী বংশ (১৫৩৮-১৫৬৪), আফগান কররানী বংশ (১৫৬৪-১৫৭৬) এবং সর্বশেষে মুঘল গভর্নরগণ (১৫৭৬-১৬১২)। বাংলার রাজধানী ১৬১২ সালে গৌড় তথা টাঁড়া থেকে ঢাকায় চলে গেলে শেরশাবাদ জাওয়ার বা পরগণা তথা গৌড় সকল গরিমা হারায়। এখানকার এইসব রাজপরিবার, তাদের আধিকারিক-সৈন্য-সামন্তরা একের পর এক গৌড়বঙ্গের মাটিতে ধীরে ধীরে কৃষক-শ্রেণীতে পরিণত হন এ ইঙ্গিত বুঝা যায় হান্টার ও ল্যাম্বরণের কথায়। একের পর এক রাজপট পরিবর্তনের ফলস্বরূপ তারা উর্বর জমিযুক্ত এই শেরশাবাদের মাটিতে সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে মিলে মিশে যায়।

শেরশাবাদিয়া আইডেন্টিটিতে মুঘল সৈন্যদেরও যে ভীষণ যোগ আছে সেকথা জানতে পারি ১৯৫৩ সালে দিল্লী হতে প্রকাশিত *Census of India 1951* (Vol. VI. Part IA)-এর রিপোর্টে। এই রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে মুঘল শাষকগণ

শেরশাবাদ পরগণায় জমির অধিকারী করে সৈনদের কৃষক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন:

> There were instance of military colonies which the Mughals deliberately made centres of population by establishing soldiers as cultivators. One such was formed by the paragana Sershabad in Murshidabad which was an outpost of Sher Shah (পৃষ্ঠা ১৯৯)।

নবাবী আমলেও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে নবাব মীর জাফর ৮০,০০০ (আশি হাজার) সৈনিককে বরখাস্ত করেন যাদের সিংহভাগই ছিল মুসলমান। যে সব সৈনিক জমি মঞ্জুরী পেয়েছিলেন তাঁরা ধনী জমিদারদের মতন রইলেন, কিন্তু বাকীরা দলবল নিয়ে পদ্মার পূর্বপারে দূর্গম অনাবাদী জমিতে বসবাস শুরু করে (অমর দত্ত পৃষ্ঠা ৪)।

১৬. শেরশাবাদিয়া উৎস সন্ধানে পারিবারিক ইতিহাস

উপরে উল্লেখিত প্রেক্ষাপটগুলোকে সামনে রেখে এবার জানতে চেষ্টা করবো, শেরশাবাদিয়াদের বর্তমান প্রজন্মের পারিবারিক ইতিহাসের হাল-হকিকত – কোন্ পরিবারে পূর্বজদের উৎস সম্পর্কে কী কথা প্রচলিত আছে। কএকটি মাত্র উল্লেখ করলাম আমাদের ভবিষ্যৎ গবেষণার একটা দিশা-নির্দেষ পাওয়ার জন্য। সাত-আট পিঁড়ি আগে আমাদের পূর্বজরা কোথাকার কী ছিলেন, সেটাকে আমরা মাথায় রাখবো।

বর্তমানে মালদহের বাঙ্গীটোলার কাসিমবাজার গ্রামের বাসিন্দা তথা পঞ্চানন্দপুর নয়া বাজার হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সাইফুদ্দিন আহমেদের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি শেরশাবাদিয়া এবং তাঁদের পূর্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদের লালবাগ এলাকা থেকে বহু যুগ আগে পঞ্চানন্দপুরের পিয়ারপুরে এসেছিলেন। গঙ্গার ভাঙনে পিয়ারপুরের একটা অংশ চলে গেছে সাহেবগঞ্জ জেলার রাধানগর থানায়। তারা বর্তমানে সেখানে পিয়ারপুর (গ্রাম ও ডাকঘর) এলাকায় বসবাস করছেন। সাইফুদ্দিন আহমেদ তাঁর বংশপরম্পরায় শুনেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষগণ নবাব সিরাজুদ্দৌলার দাদুর বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং নবাব সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত হয়ে গঙ্গাপথে রাজমহলের দিকে চলে এলে কোনো এক সময় সাইফুদ্দিন আহমেদের পূর্বপুরুষগণ চলে এসেছিল এই এলাকায়। এই কথা সাইফুদ্দিন আহমেদ শুনেছেন তাঁর বাবা মুসলিম সেখ এবং কাকা হাজী আবদুর রহিমের কাছ থেকে। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনেছে তাঁদের পিতা বারকাতুল্লাহ সেখের কাছ থেকে এবং বারকাতুল্লাহ শুনেছেন তাঁর পিতা সামতুল সেখের নিকট থেকে। বলা বাহুল্য সাইফুদ্দিন আহমেদের বাবা

মুসলিম সেখের জন্ম ১৯১৩ সাল নাগাদ এবং ৯০ বছর বয়সে ২০০৩ সালে পরলোক গমন করেছেন।

পঞ্চানন্দপুরের আর একটি শেরশাবাদিয়া পরিবারের ইতিহাস জানবো। মোস্তাফা কামাল (প্রধান শিক্ষক, পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মালদহ) এবং মেহেদী হাসান (ভূগোল শিক্ষক, বাঁশবাড়ী উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়, ইংরেজবাজার, মালদহ) দুই ভাই এবং তাঁদের পিতা জালালুদ্দিন আহমেদ (প্রাক্তন শিক্ষক, পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া উচ্চ বিদ্যালয়) মূলত্ব পঞ্চানন্দপুরের আবিরটোলার বাসিন্দা। জালালুদ্দিন আহমেদের পিতা আমাজাদ আলীও সেখানখার বাসিন্দা। আমজাদ আলীর পিতা নুর মহম্মদ বিশ্বাস ছিলেন আদি পঞ্চানন্দপুরের আবিরটোলার বাসিন্দা। নুর মহম্মদের পিতা জামিরুদ্দিন বিশ্বাস (জান মহম্মদ) ছিলেন তথা জামিরুদ্দিনের পিতা আবির বিশ্বাস ছিলেন বর্তমান ঝাড়খণ্ড বা তৎকালীন বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার উধওয়া ব্লকের আমানত দিয়াড়া গ্রামে। আবির বিশ্বাসের পিতা প্রতাপ সিংহ মণ্ডল একই ব্লকের শ্রীঘর (কাঁঠালবাড়ী) গ্রামের বাসিন্দা। প্রতাপ সিংহ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় জীবিত ছিলেন। বলা বাহুল্য উধওয়ায় বাংলার নবাব মীর কাসিমের সঙ্গে ব্রিটিশদের যুদ্ধ হয় ১৭৬৩ সালে যাতে তিনি পরাজিত হোন। সে যাহোক, এই বংশের পূর্ব পুরুষ প্রতাপ সিংহ মণ্ডল যে হিন্দু ছিলেন এটাই পরিবারের দাবী। বংশের টাইটেল মণ্ডল/বিশ্বাস জমিদারদের দেওয়া গ্রামের প্রধান বা মুখিয়া হিসেবে। আবিরটোলা নাম থেকেই বুঝা যায় একজন নাম করা মুখ্য ব্যাক্তি ছিলেন আবির বিশ্বাস। আগে গ্রামের মণ্ডলের নামে টোলা/গ্রামের নাম হতো বহুক্ষেত্রে।

আমার গ্রাম বিষণপুর (ধানগাড়া-বিষণপুর অঞ্চল, চাঁচল, মালদহ)-এর একটা প্রতিষ্ঠিত বংশের পারিবারিক ইতিহাস থেকে কিছু জানবো। এলাকায় বংশটা 'মৌলবী গুষ্টী/বংশ' নামে পরিচিত, কারণ এই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আজিজ ১৮৯০ সালের আশেপাশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পাঁচ ছেলের নাম হাজী আব্দুল করিম, হাজী মহম্মদ আলি বিশ্বাস, হাজী সহাবুদ্দীন, হাজী নৈমুদ্দিন এবং হাজী আবদুল্লাহ। তাঁর তিন কন্যার নাম মেহেরজান, মেহের আবজান এবং যয়নাব। হাজী মহম্মদ আলি বিশ্বাসের প্রথম সন্তান হলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারের নিমুনিয়া কাপাসিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মরহুম আরজাউল হক যিনি (এবং তাঁর সহপাঠী গিয়াউসুদ্দিন, প্রাক্তন শিক্ষক, ভালুকা আর.এম.এম.এম বিদ্যাপীঠ) বিষণপুর গ্রামের প্রথম মাস্টার ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যাক্তি। মহম্মদ আলির দ্বিতীয় সন্তান মহম্মদ সিরাজুদ্দিন ধানগাড়া বিষণপুর হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক যে স্কুল থেকে আমি ১৯৮৪ সালে হাই মাদ্রাসা বোর্ডে প্রথম স্থান প্রাপ্ত হই। তাঁর অন্য সন্তানগণ হলেন হাজী হুমাউন কবির, ড. মতিউর রহমান (এম.ডি, প্রাক্তন চেস্ট স্পেস্যালিস্ট, বহরমপুর সদর হাসপাতাল এবং আমাদের

অঞ্চলের প্রথম ডাক্তার), হবিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান (প্রাক্তন শিক্ষক, নুরপুর হাই স্কুল, রাতুয়া, মালদহ) এবং মহ. সফিকুল আলম (শিক্ষক, দহিল হাই স্কুল, গাজোল, মালদহ)। এই মৌলবী বংশের মাওলানা আব্দুল আজিজের পুর্বপুরুষদের বসতি ছিল মুর্শিদাবাদের গঙ্গার উপকুলবর্তী হাসেনপুর দিয়ারায়। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ মাওলানা আসিরুদ্দিন, তাঁর পিতা আলহাজ্জ মাওলানা দিলজান, তাঁর পিতা বাহাদি, তাঁর পিতা আহাদি, তাঁর পিতা কুশ, তাঁর পিতা লব। এই বংশের প্রথম পুরুষ যদি 'লব' হয় তাহলে এই বংশের বর্তমান প্রজন্মের সফলতম ব্যাক্তি তোফাজ্জল হক (পিতা আরজাউল হক তথা ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের বাংলাদেশ শাখার প্রধান ম্যানেজার) হলেন নবমতম প্রজন্ম। এই বংশের পারিবারিক মত হলো যে বংশের পুর্বপুরুষ লব এবং কুশ ছিলেন হিন্দু। এই তথ্যগুলি এই বংশের আলহাজ্জ হুমায়ুন কবীরের ছেলে ইকবাল কবীর (গ্রাম-পঞ্চায়েত সহায়ক)-এর নিকট হতে একটি পারিবারিক ডায়েরীর পাতা থেকে নিয়েছি।

আমার পরিবারের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস এই রকাম। বর্তমান গ্রাম বিষণপুর, দক্ষিণ পাড়া (ডাকঘর ধানগাড়া, থানা চাঁচল, মালদহ)। আমার পিতার ঠাকুরদারা তিন ভাই অবিভক্ত মালদহের শিবগঞ্জ থানার চাঁদপুর থেকে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের দিকে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর অঞ্চলের কেচুয়াহী গ্রামে আসেন। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর রতুয়া থানার ভাদো গ্রামে কয় বছর ছিলেন। অবশেষে ১৯১২ সালের দিকে তাঁরা তিন ভাই বিষণপুরে স্থায়ী হোন। লাহার ব্যবসার সঙ্গে এঁরা যুক্ত থাকায় বংশটি লাহিটা বংশ নামে পরিচিত ছিল। এই বংশের ১ম পুরুষ বাবু মণ্ডলের বাড়ি ছিল চাঁপাই-নবাবগঞ্জের পাঁকা নারায়ণপুর। সেখানে বন্যার সময় জলের মধ্যে টঙ বেঁধে টঙেই বাস করতে হতো তাঁদের। এক শিশু টঙ থেকে পড়ে গিয়ে জলে ডুবে বা ভেসে চলে যায়; ওর শরীর পাওয়া যায়নি। শোকাহত হয়ে এই বংশ পাঁকা নারায়ণপুরের দিয়াড়া ছেড়ে চলে আসেন শিবগঞ্জ থানার চাঁদপুরে। ২য় পুরুষ: বাবু মণ্ডলের ছেলে হলেন আমির মণ্ডল (পাঁকানারায়নপুর > চাঁদপুর, শিবগঞ্জ)। ৩য় পুরুষ: আমির মণ্ডলের তিন পুত্র বিলাত আলি মণ্ডল, আফানুদ্দিন এবং ইসমাইল। ৪র্থ পুরুষ: আফানুদ্দিনের ছেলে জনাব আলি ও মিছু সেখ; ইসমাইলের কন্যা হাফসা; বিলাত আলির তিন ছেলে মোল্লা আব্দুল কদ্দুস (মৃত্যু ১৭/১০/১৩৭২ বঙ্গাব্দ), আলহাজ্জ মহ. আক্রাম আলি মণ্ডল (মৃত্যু ১৩/১০/১৯৯৩) এবং পণ্ডিত সিদ্দিক। ৫ম পুরুষ: আক্রাম আলির দুই ছেলে আব্দুল হাকিম (জন্ম ১৫ ভাদ্র ১৩৫০ তথা ইংরেজী ১৯৪৩; পেশা: আমিন) এবং লোকমান হাকিম (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, শৌলমারী এম. এস. কে.)। ৬ষ্ঠ পুরুষ: আমি আব্দুল হাকিমের বড় সন্তান আব্দুল অহাব। আমি আমার দাদু আক্রাম আলির মুখ থেকে শুনেছি তথা আমার পিতা ও বড় পিসির নিকট থেকেও

একই কথা শুনেছি যে আমাদের পুর্ব পুরুষ বাবু মণ্ডলদের পূর্বজগণ খুব সম্ভব হিন্দু ছিল।

এইসব পারিবারিক ইতিহাস থেকে এটা পুষ্ট হয় যে শেরশাবাদিয়া আইডেন্টিটিতে বহু মিশেল রয়েছে। উপসংহারে এইটুকু বলা যথেষ্ট যে, শেরশাবাদিয়াগণ এক মিশ্র জনজাতি। এদের মূল হলো গৌড়বঙ্গের আদি জনগোষ্ঠী যারা শায়েখ-পীর-ওয়ালী-মুবাল্লিগদের হাত ধরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই জনজাতির অন্তর্ভূক্ত হয় রাজক্ষমতার পালা বদলে গৌড়-পাণ্ডুয়ার একের পর এক রাজা-বাদশাহদের বংশজগণ ও তাদের সৈন্যসামন্তরা। গৌড়-পাণ্ডুয়া রাজধানী নগর হওয়ার সুবাদে বাহির থেকে আসা বণিক তথা ধর্মপ্রচারকদের অনেকেই স্থানীয় সমাজের মধ্য লীন হয়ে যান। এইভাবে বহু নদীর মোহনাযুক্ত কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলে একটি জনজাতির উদ্ভব হয়। বাঙলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের মিলন মোহনায় তথা রাঢ় ও বরিন্দ অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনকারী যে বিশাল শেরশাবাদ স্থানাঞ্চল অবস্থান করত, তারই ভুমিপুত্রস্বরূপ পরিচয়বহনকারী নামটি হলো শেরশাবাদিয়া। এখন শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীদের বংশজ ও অংশজগণই বাংলার বিভিন্ন জেলায়, বিহারে তথা ঝাড়খণ্ডে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠী

মোক্তাদুর রহমান

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তে সূর্যাস্ত হয় স্বাধীন ভারতের আলোর। যা ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে একটি কালো সময় নিয়ে আসে। ব্রিটিশ শাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। ব্রিটিশদের অত্যাচার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তিতুমীর। ২৪ পরগনা ও নদীয়াতে তিনি মূলত ওয়াহাবী আন্দোলন ও নানান সমাজসংস্কারক মুলক কর্মকাণ্ড থেকে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। তার এই আন্দোলন বাঙালি কৃষক সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে ও কৃষিশস্যে অতিরিক্ত কর চাপানোর ফলে শেরশাবাদ পরগণা এবং তার সংলগ্ন কৃষি-নির্ভর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা অসহায় হয়ে পড়ে। তৎকালীন এই পরগণার নামে এই জনগোষ্ঠীর পরিচয় পরবর্তীতে "শেরশাবাদিয়া" নামটি স্বীকৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে এই জনগোষ্ঠীর মানুষের মনে ধীরে ধীরে ব্রিটিশবিরোধী চেতনা দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে অবিভক্ত মালদার দক্ষিণাংশে নারায়ণপুরে গড়ে ওঠে ব্রিটিশবিরোধী শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠির নিজস্ব ঘাঁটি। রফি মণ্ডলের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক শেরশাবাদিয়া যুক্ত হয় ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে। আন্দোলনটি প্রথমে শির্ক ও বেদাত কর্মকাণ্ড থেকে সমাজকে সংস্কারমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাজে জড়িয়ে পড়ে। রফি মন্ডলের সঙ্গে এনায়েত আলীও এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্ব দেন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় আট হাজার সংগ্রামী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই আন্দোলনের যোগ ছিল শহীদ সৈয়দ আহমেদ বেরলভীর আন্দোলনের সঙ্গে যাকে ব্রিটিশগণ "ওয়াহাবী মুভমেন্ট" নামে চিহ্নিত করেছিল।

সেই সময় শেরশাবাদিয়া সমাজে দান ও যাকাতের পাশাপাশি 'মুঠি' নামে নতুন একটি প্রথার উদ্ভব হয় । খাবারের রান্না বসানোর সময় ঘরে মৌজুদ অন্ন-দানার একমুঠো অংশকে সরিয়ে রেখে সেটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে আর্থিক সাহায্যের জন্য দেওয়া হতো। 'মুঠি' হলো ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে শেরশাবাদিয়াদের নিজস্ব প্রতীক। ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবের কারণে ইংরেজ সরকার রফি মন্ডল কে গ্রেফতার করেন । পরবর্তীতে ১৮৫৩ সালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রফি মন্ডলের পরে আন্দোলনের দায়িত্বভার তাঁর ছেলে মৌলভী আমিরুদ্দিন গ্রহণ করেন। এছাড়া মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীতে আব্দুল করিম এবং অবিভক্ত বিহারের দুমকা জেলাতে ইব্রাহিম মন্ডল এর নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দী এই মাঝামাঝি সময়ে সারা ভারতে তখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা ক'রে বহু বিপ্লবীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। ব্রিটিশরা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয় এবং নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে শহীদ হন। বিদ্রোহ থামাতে ভারতের শাষণভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে ইংল্যান্ডের রানী

ভিক্টোরিয়ার হাতে স্থানান্তরিত হয় । যার দরুণ ভারতে ব্রিটিশ রাজ শুরু হয় । ব্রিটিশবিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৮৭০ সালে আদালত আমিরুদ্দিনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা দিলেও পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে তাঁকে আন্দামানের কারাবাসে পাঠানো হয়। স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার কারণে শেরশাবাদিয়াগণকে অপরাধ-প্রবণ সম্প্রদায় হিসেবে ভাবতে থাকলেও পরে এদের উন্নত ও উত্তম কৃষক শ্রেণী হিসেবে প্রশংসা করেছে ব্রিটিশগণ।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার নতুন ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিপ্লবের কারণে বহু শেরশাবাদিয়া বিপ্লবীদের জেলে বন্দী করা হয় যাদের মধ্যে অনেককে শহীদও হয়। বিপ্লবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হল -

১. আব্দুল আলী দর্জি, মালদা,
২. হায়দার আলী, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর,
৩. শুকুরুদ্দিন গাজী, পিতা রফি মন্ডল, নারায়ণপুর,
৪. সোমরুদ্দিন, কারবোনা, মালদা,
৫. বেলায়ত আলি, কারবোনা, মালদা,
৬. গাজী মাওলানা আব্দুল ওহাব সালাফি, কারবোনা, মালদা,
৭. তাফিরুল্লাহ গাজি, বাটনা, মালদা,
৮. গাজী উসমান, ভাদো, মালদা,
৮. ফারজান্ত আলি, ভাদো, মালদা,
৯. দাউদ গাজী, বিষণপুর, মালদা,
১০. সিরাজুদ্দীন গাজী, বিষণপুর, মালদা।

পরাধীন ভারতের ইতিহাসে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কাকদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু অনেক নাম চাপা পড়ে গিয়েছ ধুলোবন্দি কাগজে। ভুলতে বসা এই শেরশাবাদীয়া সংগ্রামীদের নাম ও তাদের সংস্কারের অবদান দেশ ও সমাজের জন্য কম কিছু ছিলনা।

তথ্যসুত্র:

১. হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস (৩য় সংস্করণ), লণ্ডন, ১৮৭৬, পাতা ৭৯-৮৩, ১০০।
২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *আহলে হাদীস আন্দোলন: উৎপত্তি ও কর্মবিকাশ* (দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিৎ সহ), ঢাকা: হাদীস ফাউণ্ডেশন, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৪১১,৪২০।
৩. অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ১১৮।
৪. মহ. আকরামুল হক, *ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যারাবিক অন বেঙ্গলি ডাইলেক্ট অফ শেরশাবাদি কমিউনিটি* (পি.এচ.ডি. থিসিস), চ্যাপ্টার-২, আরবী বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।

'কিসান' ও 'শেরশাবাদিয়া': একই মায়ের দুই সন্তান

সুকান্ত মণ্ডল

মালদা জেলার উল্লেখযোগ্য একটি জনজাতির নাম হলো 'কিসান'। । মালদা জেলা ছাড়াও বিহারের পূর্ণিয়া, কাটিহার ও ঝাড়খন্ডে এদের বসবাস। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষত কৃষিকাজের মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করে। এরা নিজেদের পরিচয় দেয় 'বাঙালী' বলে, ফলে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের ওই নামেই চেনে। এই সম্প্রদায়ের মানুষ সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও এদের সাথে প্রতিবেশী মুসলিম 'শেরশাবাদিয়া' জনজাতির ভাষা, বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস, জীবিকার প্রায় অদ্ভুৎ মিল রয়েছে। 'কিসান' জনজাতির প্রচলিত কয়েকটি গান উল্লেখ করবো এই লেখায়, যাতে করে এই সম্প্রদায়ের ভাষার একটা ধারণা পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিক এই উপাদানগুলি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে 'কিসান' হলো 'শেরশাবাদিয়া'রই সহোদর ভাই।

যেহেতু, কিসান সম্প্রদায়ের লোকেদের জীবিকাই হলো চাষবাস ও পশুপালন, সেহেতু পশুপালনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উঠে আসে গরু। এরা বিভিন্ন গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গরুকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বাংলার শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়দিনের চাঁদে দুগ্ধবতী গরুর পূজা করা হয়। এইসময় যাদের বাড়ির গরুর দুধ হয় তারাই এই পূজার আয়োজন করে থাকে। এই পূজার মূল উদ্দেশ্য হলো গরু যেন বেশী দুধ প্রদান করে। একে অনেকে 'গো-ধন' পূজা, আবার অনেকে 'গোরখনাথের পূজা' বলে থাকে। এই পূজা রাখালেরা নিজেরাই করে, কোনো পূজারী বা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন মনে করে না। এই পূজা করার সময় রাখালেরা সমবেত ভাবে যে গানটা গেয়ে থাকে তাহলো:

চাপ্ কোদোলে তুলনু মাটি
তাতে বস্যাইনু পসরা হাটি।
হ্যাঁইচ্চো...

চাপ্ কোদোলে তুলনু মাটি
তাতে বস্যাইনু গিরস্যা হাটি।
হ্যাঁইচ্চো...

চাপ্ কোদোলে তুলনু মাটি
তাতে বস্যাইনু গোয়্যাল্যা হাটি।
হ্যাঁইচ্চো...

[ওরে ভাই গোয়াল, হামার বাড়িতে গোরখনাথের পূজা হৈবে; দুধ, ফুল জোগাও...]
চাপ্ কোদোলে তুলনু মাটি
তাতে বস্যাইনু কুইঞ্জরা হাটি।

হ্যাঁইচ্চো....

[ওরে ভাই গিরোস, হামার বাড়িতে গোরখনাথের পূজা হৈবে; কলা-মূলা জোগাও...]
চাপ্ কোদোলে তুলনু মাটি
তাতে বস্যাইনু পানুয়া হাটি
হ্যাঁইচ্চো...

[ওরে ভাই পানুয়া, হামার বাড়িতে গোরখনাথের পূজা হৈবে; পান-সুপারি জোগাও...]
উত্তর থ্যাইক্যা অ্যাইলো কালি
কালি কহে, হামার দুধে সাগর বহে,
হ্যাঁইচ্চো...

পশ্ছিম থ্যাইক্যা অ্যাইলো গোলি
গোলি কহে, হামার দুধে সাগর বহে। হ্যাঁইচ্চো...

দক্ষিণ থ্যাইক্যা অ্যাইলো ধোলি
ধোলি কহে, হামার দুধে সাগর বহে।
হ্যাঁইচ্চো...

পূর্ব থ্যাইক্যা অ্যাইলো শামলি
শামলি কহে হামার দুধে সাগর বহে।
হ্যাঁইচ্চো...

ভীমের মা ত্যাল দ্যাও
ভীমের গাও খাকরাস-মাকড়াশ।
হ্যাঁইচ্চো...

ভীম বাড়িতে রইহল্যে ভাত-হাঁড়ি টানে
আর মাঠে গ্যাইলে ঘাস-আঁটি আনে।
হ্যাঁইচ্চো...

গানটির এই পর্যায়ের শেষে বাড়ির গৃহকর্ত্রী সমবেত রাখালদের হাতে সরিষার তেল দেয়। রাখালেরা এই তেল নিয়ে নিজের কাছে থাকা লাঠির গায়ে মালিশ করে। তারপর...

শওবার মানি একবার শুঝি
গোরখনাথের পূণ্যে পূজি।
হ্যাঁইচ্চো...

এই গানে বর্ণিত কালি, গোলি, ধোলি, শামলী হল বিভিন্ন রঙের গরু। এই গানটির জন্যে ঋণস্বীকার করছি: শ্রী জটাধারী মণ্ডল, ডোমনটোলা, সুকসেনা, ভূতনী, মালদা।

কিসানদের গানের সঙ্গে তুলনার জন্য একটি শেরশাবাদিয়া খেলার গান/ছড়া উল্লখ করছি:

ইটকি বিটকি চান্ চিটকি
চানের বেটা লখিন্দর
সাইজ্যা আইলো দামোদোর,
দামদোরের বাড়িতে আছে,
জোড়া জোড়া কবিতর,
সেই কবিতর মারা পড়ল
খোপ্পের ভিতর।
আইল গুড়াগুড়, বেল গুড়াগুড়
খোলস্যা মাছের ঝোল;
বুড়ি, কাঁকখই খ্যান তুল।
আইল পাত ব্যাল পাত
তুই তুল সোন্নার হাত।

(সুজয় ঘোষ, মালদহ জেলার দক্ষিন অংশের বাংলা কথ্যভাষা: ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (প.এচ.ডি. থিসিস), ২০১১, পৃ. ৩৮৪)

এই গানটির মধ্যে উল্লেখিত চাঁদ সওদাগর এবং তাঁর সন্তান লখিন্দর প্রসঙ্গটি প্রমাণ করছে কীভাবে শেরশাবাদিয়া গণস্মৃতির গভীরে প্রথিত রয়েছে বাংলার হিন্দু লোকসংস্কৃতির ছাপ যা মনসামঙ্গল কাব্যের গল্পটাকে মনে করিয়ে দেয়। এই ভাষাগত এবং বিষয়গত সূত্রগুলি কি প্রমাণ করে না যে শেরশাবাদিয়া ও কিসান – উভয়ের পূর্বজ কয় শতাব্দী পূর্বে একই ছিল?

কৃষিকাজে শুধু কিসান পুরুষেরা নয়, মহিলারাও সেই কাজের অংশীদার হয়। উদবৃত্ত ফসলকে ঘরে তোলা ও গোলাতে ভরা সমস্ত কাজেই মহিলারা সামিল হয়। জমির ধানকে সেদ্ধ-ভাপা করে সেটাকে ঢেঁকিতে ভানার কাজ সাধারনত মহিলারাই করে। ঢেঁকিতে ধান-ভানার সময় মহিলারা সমবেত কন্ঠে একধরণের গান গায়। যেমন,

ঢিক্কি ধান বাঁন্ধে রে....
সোনার কামিনী ঢিক্কি ধান বাঁন্ধে রে।
ধান বাঁন্ধো ধান বাঁন্ধো মথুরারও বাণী।
অষ্ট সখী ধান বাঁন্ধো ষোলশ গোপিনী॥
ঢিক্কি হামার ব্যাট্টা-ভাতার ঢিক্কি হামার হিয়া।
ঢিক্কির কাম্যাইয়ে দিনু সাত ব্যাটার বিহা॥
ঢিক্কি গ্যালো গড়-গড়্যাইতে, কুলা গ্যালো রসে।

কাট্‌ঠা গ্যালো বাপের বাড়ি, লাইড়্যা খাবো কিসে॥
কুলা গ্যালো গড়-গড়্যাইতে, কাট্‌ঠা গ্যালো রসে।
ঢিক্কি গ্যালো বাপের বাড়ি, ব্যাঁইন্ধ্যা খাবো কিসে॥
কাট্‌ঠা গ্যালো গড়-গড়্যাইতে, ঢিক্কি গ্যালো রসে।
কুলা গ্যালো বাপের বাড়ি, ঝ্যাইড়্যা খাবো কিসে॥
খুট্টা জোড়া উইঠ্যা কহে, হামরা মল্লের ভ্যাই।
অষ্ট সখী ধান বাঁন্ধে, হামরা গান গ্যাই॥
গুল্‌হাখানা উইঠ্যা কহে, হামি লুহার কাঠি।
অষ্ট সখী ধান বাঁন্ধে, হামি চাউল ছ্যাঁটি॥
ঢিক্কি ধান বাঁন্ধে রে....
সোনার কামিনী ঢিক্কি ধান বাঁন্ধে রে॥

উপরোক্ত গানটি সংগ্রহের জন্য ঋণ-স্বীকার: শ্রী রাধেশ্যাম মণ্ডল, ডোমনটোলা, সুকসেনা, ভূতনী, মালদা।

ঢেকিতে ধান ভাঙার সময়ে শেরশাবাদিয়া নারীরাও সমবেত গীদ গায়। হিন্দুধর্মের কিছু কিছু উপাদান মুসলিম মেয়েদের গীদেও পাওয়া যায়। একটি মুসলিম গীদে হলুদ এবং শাঁখার প্রসঙ্গটি পাওয়া যাচ্ছে:

কাঁচা হলোদরে বাছা সর্ব রঙের ফোটা,
পিঠে হলোদরে বাছা গোটা আরও গোটা,
ক্যালই বিহ্যানেরে হামি সোনার আইন্যা বসাব,
গড়্‌হাইয়া লিবো রে হামি দোনো হাতের শাঁখা...

(সুজয় ঘোষ, মালদহ জেলার দক্ষিন অংশের বাংলা কথ্যভাষা: ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (প.এচ.ডি. থিসিস), ২০১১, পৃ.৩৬৮)

শেরশাবাদিয়া মহিলারা পর্দানশীন হওয়ায় মাঠেঘাটে কাজ করতে বেরোয় না। অন্য সম্প্রদায়ের নিকট থেকে বিয়ের গান শিখে নতুন করে গাওয়ার সম্ভাবনাও নেই তাদের মধ্যে। অথচ যুগযুগ ধরে তাদের মধ্যে চলে আসা এই গানগুলো প্রমাণ করছে এক সময় শেরশাবাদিয়া জনজাতির অধিকাংশই তিন-চার শতাব্দী আগে হয়তো কিসানদের মতই হিন্দু ছিলো।

মালদা জেলার প্রায় দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার কিসান সম্প্রদায়ের মানুষজন গঙ্গা, ফুলাহার ও কোশী নদীর আশেপাশের অঞ্চলে বসবাস করে। এই অঞ্চলগুলি 'দিয়াড়া' অঞ্চল নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের ভাষা আর শেরশাবাদিয়াদের ভাষা একই কয়েকটি ক্ষেত্রবিশেষ বাদে। যেমন, কিসানরা বলে “হামাঘরে” কিন্তু শেরশাবাদিয়ারা বলে “হামারঘে”। একই মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে যেমন কিছু কিছু আলদা বৈশিষ্ট্য থাকে, ঠিক তেমনই “কিসান” ও “শেরশাবাদিয়া”র মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং, পরিশেষে বলাই যায়, কিসান ও শেরশাবাদিয়া হলো একই মায়ের দুই সন্তান।

শেরশাবাদিয়া-গবেষণার পথিকৃৎ আব্দুস সামাদ

ইউমনা লাবিবা

পেশায় উকিল তথা নোটারী পাবলিক, মালদহ কোর্ট। নেশায় কবি-সাহিত্যিক এবং সমাজ ও ইতিহাসের গবেষক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. এবং এল.এল.বি. ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তিনি মালদহের ভূমিপুত্র তথা শেরশাবাদিয়া জনজাতিরই একজন স্বনামধন্য উজ্বল ব্যাক্তিত্ব। তাঁর নেশাকে ঘিরে তাঁর জন্মভিটেতে ১৯৮৯ সালে তিনি গ'ড়ে তোলেন "বাদিয়া বার্তা প্রকাশনা", হোসেনপুর, গোয়াল পাড়া, মালদা। সেখান থেকেই শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রথম ও একমাত্র ত্রৈমাসিক কাগজ *বাদিয়া বার্তা* প্রকাশ করতে শুরু করেন ১৯৮৯ সাল থেকে নিজ সম্পাদনায়। প্রকাশিত হয় তাঁর শেরশাবাদিয়া বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ, যেমন, *(শেরশা)বাদিয়া গীতি: লোকইতিহাস লোককাহিনী লোককথা, (শেরশা)বাদিয়া বাগধারা: ছড়া- প্রবাদ ও শব্দকোষ: শব্দাভিধান, শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য,* শেরশাবাদিয়া প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কেনে কিগোনে* ইত্যাদি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস সহ সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস গবেষণার ৭৫-এর অধিক গ্রন্থ রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো *জেলা মালদহের পীর-ফকিরদের কথা, মালদা জেলার পীর ও সাধু-সন্যাসীদের ইতিহাস, জেলা মালদহের ইতিহাস ও মালদহ সমগ্র* (১ম ও ২য় খণ্ড), *মালদা জেলার জনজাতি: ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, বাংলার মুসলমান জনজাতি, মালদা জেলার স্থাননামের ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত, My Discovery of Ancient Gaur at Kandaran and its Connected Surroundings, প্রসঙ্গ গৌড়: গৌড় নগর, মণ্ডল, বিষয়, জনপদ ও রাষ্ট্র* ইত্যাদি। স্থানাভাবে শেরশাবাদিয়া বিষয়ক মাত্র দুইখানি গ্রন্থের আলোচনা করবো এখানে।

১. *শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য* (১৯৮৭): প্রথম শেরশাবাদিয়া-গবেষণা গ্রন্থ

কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং সমাজবিদ আব্দুস সামাদই প্রথম যিনি শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা ও লোকসাহিত্য ইত্যাদির উপর পূর্ণাঙ্গ মাত্রার একটি গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁর বহুল প্রশংসিত ও বহু পুরস্কার প্রাপ্ত সেই গ্রন্থখানি হল *শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য* (১৯৮৭) । সেই অর্থে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কিছু প্রকাশিত সরকারী বইপত্রে বিছিন্ন কিছু কথা ছাড়া শেরশাবাদিয়া বিষয়ে তেমন কেউ লেখেন নি। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে তাঁর দীর্ঘ গবেষণা তথা ফীল্ড-ওয়ার্কের ফসল এই গ্রন্থটি যা ১৯৮৭ সালে প্রথম প্রকাশের পর এখন পর্যন্ত ৫টি সংস্করণ পেরিয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে নতুন করে কেউ কেউ লিখেছেন বা লিখছেন। যেমন মীর রেজাউল করিম তাঁর *শেরশাবাদিয়া ভাষা ও সংস্কৃতি* (১৯৯৯) গ্রন্থের ভূমিকায় আব্দুস সামাদের ঋণস্বীকার করে লিখেছেন: "তবে, এ বিষয়ে যাঁর কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা লাভ করেছি, তিনি হলেন এই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি-চর্চার নিরলস গবেষক সামাদদা (আব্দুস সামাদ, আইনজীবী, মালদা কোর্ট)"।

শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য গ্রন্থের (৩য় সংস্করণ, ২০০৩) সূচীপত্রে চোখ বুলালেই ধরা পড়বে শেরশাবাদিয়া সমাজের সার্বিক প্রেক্ষিৎ ও চিত্র তিনি কীভাবে তুলে ধরেছেন:

১. ইতিহাস (শেরশাবাদ স্থানটির প্রকৃত অবস্থান নিরূপণসহ),
২. শাখা-উপশাখা,
৩. নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,
৪. জনসংখ্যা,
৫. বসতি-অঞ্চল,
৬. গ্রাম-ঘর,
৭. ভাষা,
৮. শিক্ষা,
৯. সাহিত্য-সংস্কৃতি,
১০. জীবন-জীবিকা,
১১. খাদ্য-খাবার,
১২. বাসন-কোসন,
১৪. পোশাক-আশাক,
১৫. গয়না-গাঁটি,
১৬. শিল্পকলা বা হাতের কারুকাজ,
১৭. পদবী-উপাধি,
১৮. গলদ,
১৯. অন্যায়-অপরাধ ও আইন-আদালত,
২০. গালি-গালাজ ও খিস্তি-খেউর,
২১. কুসংস্কার,
২২. খেলাধুলা,
২৩. লোকনাট্য বা নৃত্যাভিনয়,
২৪. ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি,
২৫. বিবাহ: রীতি-নীতি ও লোকাচার,
২৬. ছড়া-বাগধারা,
২৭. লোককাহিনী-লোককথা,
২৮. ও.বি.সি সার্টিফিকেট প্রাপ্তির নিয়মাবলী,
২৯. তুলনামূলক পাঠ-আলোচনা, এবং
৩০. পরিভাষা ও শব্দাভিধান।

শেরশাবাদিয়াদের ইতিহাস-প্রসঙ্গে এম. ও. কার্টার উল্লেখিত একটি লোকশ্রুতি ও অনুমানের উপর জোর দিয়ে কিছু যুক্তি দিয়ে যেমন তিনি বুঝানের চেষ্টা করেছেন যে, এই জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষগণ শেরশাহের সৈন্যদের বংশধর, তেমনি এদের এক বড় অংশ ধর্মান্তরিত স্থানীয় মানুষের বংশজ, সেটাও আলোচনা করেছেন। এই বিতর্কিত ইস্যুটা বাদ দিলেও, শেরশাবাদিয়া সমাজের সমগ্র চিত্র

যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন, তার জন্য তিনি শেরশাবাদিয়া জনসমাজে তথা ইতিহাসের পাতায় এক অগ্রপথিক পণ্ডিত ব্যাক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

২. *কেনে কিগোনে:* প্রথম শেরশাবাদিয়া কাব্যগ্রন্থ

আব্দুস সামাদ-এর *কেনে কিগোনে* শিরোনামের বইটি হ'ল শেরশাবাদিয়া ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় সেই বিগত ১৯৮০-৮৫ সালের সময়কালের সংশ্লিষ্ট মালদা জেলা বইমেলায়। যা'হোক, একান্তই স্থানাভাব হেতু এবারে এই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি থেকে সামান্য কয়েকটি মাত্র কবিতা প্রদত্ত হল এখানে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে।

১.

লাড়বি? লাড়হ্।
কার গতোর ?
কাড়ভি?
কাড়হ্,
কার ছতোর্ ?
আর কাহারু লয়,
অয় শোর,
খালি তোর।

২.

অ্যাতো কথা কৈহলে পারে
কোহবি যে উ কেনে ঢের কৈহ্ছে।
নাতো রিয়্যা মোল্লেরঘে
বিয়্যা গ্যাইট্যা উ কেনে ফের দুইহ্ছে?

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শেরশাবাদিয়া কবিতা ছাড়াও, তাঁর নিজস্ব রচিত বহু সংখ্যক শেরশাবাদিয়া গীত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আছে। সেই গানগুলিতে প্রথমা সুর-আরোপ করেছেন তাঁর কন্যা আশা ফিরদৌসী যাঁর লেখা উর্দু-বাঙলা শায়েরী গ্রন্থ *দিল সে করলুঁ কুছ গুফতুগুঁ* বিশেষ প্রশংসিত। শেরশাবাদিয়া গীদ-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের উভয়ের এই বিশেষ অবদান ঐতিহাসিক মাইল-স্টোন হয়ে থাকবে।

এই সব কীর্তির জন্য তাঁর জীবনী ও গ্রন্থালোচনা স্থান পেয়েছে বিশ্বখ্যাত রিফারেন্স গ্রন্থাবলীতে যেমন, *বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা ও গ্রন্থপঞ্জী*, *Asia Pacific Who's Who, Who's Who of the Indian Writers, Reference India, Reference Asia* ইত্যাদি। শেরশাবাদিয়া জনজাতির প্রতি তাঁর অবদান অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। আমরা তাঁর সুদীর্ঘ সুস্থ কর্মজীবনের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি।

আম-কেন্দ্রিক প্রবাদ: মালদহের জনজীবন

মুহা. আকমাল হোসেন

ইতিহাস সমৃদ্ধ মালদাহ। খনন করতে পারলে অনেক ইতিহাস। অনেক ভাঙচুর উত্থান-পতনের সাক্ষী। এখনো এখানে চূর্ণ টেরাকোটার ভগ্ন বিষাদ! কালো কালো পাথরের থামগুলো শক্ত শিরদাঁড়া। প্রাচীন অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আকাশমুখি গম্বুজ। আছে প্রকৃতির সবুজ টিয়া রং। আছে রেশমি দিনযাপনের জগত খ্যাতি গল্প। সব অতীত- কিন্তু, এক ধূসর কঠিন বাস্তবতা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে গঙ্গা-মহানন্দা-স্নাত দোয়াব-বরেন্দ্রী মাটি। বেঁচে আছে মালদার আম। কথায় আছে:

১. আম, রেশম, ধান --
তিন মালদার জান।

আম মালদার অর্থনীতির প্রাণ। যার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। এবং ইদানিং এই কারনেই এই ক্ষুদ্র এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাটি দেশ তথা বিশ্বনন্দিত। তার অন্যতম সম্পদ আম। সেই গৌরবের বিবর্তনের পথ ধরে অগ্রগতির পথে এই জেলা। শুধু আমের ই নির্যাস নয়,আম ত্বকের রসালো অংশের নিচে আছে একটি আঁটি (গুটি)। তারপরে বীজপত্র। গল্পটা সেই তলানি পর্যন্তই। সন্ধান করি জেলার আমের উৎস। ইতিহাসের শিকড়-বাকড়। আর এই শিকড় থেকে পাতাময় সবুজ আমবাগান। কি করে ছায়া দেয়, হাওয়া দেয়, খাদ্য দেয় এবং লোক-জীবন, লোক-বিশ্বাস ও লোক-সাহিত্যকে শক্ত সবুজ কণ্ঠল করে তোলে তা আলোচনা করবো। তার আগে একটু ইতিহাস ঘেঁটে দেখি, সন্ধান করি শিকড়ের।

খ্রিস্ট-জন্মের দু-তিন হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে আম হত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে “আম্র” শব্দটি পাওয়া যায়, যা লেখা হয়েছিল খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগে। আম্র শব্দটি সংস্কৃত। যা থেকে আম শব্দটির উদ্ভব। আলেকজান্ডার ভারত অভিযানের সময় ৩২৭ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে তার বিশাল সেনাবাহিনী আমবাগানে ছাউনি স্থাপন করে। তারা সিন্ধু উপত্যকার বিশাল আমবাগানের গুণকীর্তন না করে পারেননি। আর এ প্রশংসাই ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল। তারপরে অনেক বিদেশি পর্যটক এদেশে আমের গুণকীর্তন করেছেন, উল্লেখ্য হিউ-এন-সাঙ, ইবনে ইউকুল প্রমুখ।

উদ্যান বিজ্ঞানী ডঃ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা থেকে জানা যায় আমের জন্য ভারত বর্ষ অন্যদেশের কাছে ঋণী নয়। যেসব আমের নাম পাওয়া যেত তার জন্মস্থান আসাম থেকে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু লোক ইতিহাস ও সার্বজনীন ইতিহাস অনুযায়ী আমের জন্ম হিমালয়ের পাদদেশের সমভূমিতে। এই দেশ থেকে আম বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সহমত পোষণ করেছেন একালের গবেষক ডঃ মুখোপাধ্যায়। ভারত বর্ষ নদীমাতৃক দেশ। নদী বিধৌত সমভূমি তে ছিল আমবাগান। তবে দেশের

সর্বত্রই কমবেশি আমবাগিচা ছিল। বিশেষ করে বঙ্গদেশ গুজরাট দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি। বঙ্গদেশের আম চাষ সুপ্রাচীন। গাঙ্গেয় সমভূমিতে আম চাষ হতো। বিশেষ করে রাঢ় ও দিয়ারা সহ সেই প্রাচীন গৌড়-পাণ্ডুয়ার ভূমিতে প্রচুর আম হত। সেই প্রাচীনকাল থেকেই ঝাড়খণ্ডেরও আমচাষ লক্ষ্য করার মতো।

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা মালদা। না উত্তরে, না দক্ষিণে, ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিক দিক দিয়ে জেলাটির তিনটি ভাগ। বরিন্দ, টাল, দিয়ারা। নদীকেন্দ্রিক এই যে জেলার বুক চিরে গেছে মহানন্দা। দক্ষিণে প্রবাহিত গঙ্গা। পূর্বে পুনর্ভবা, পশ্চিমে ফুলহার।মধ্যে ভাগীরথী, পাগলা প্রভৃতি। এ নদী মাত্রিকতা জেলার মাটিকে করেছে উর্বর। তাই আমের ইতিহাসও আদিকালের। হিন্দু রাজের অনেক আগে থেকেই জেলায় আম চাষ হতো। পাল সেন যুগের বহু স্থাপত্যে আমের ছবি আছে। সুলতানি ও মুঘল আমলে অনেক চিত্রে ও ভাষাচিত্রে আম ব্যবহার হয়েছে যা আজও বর্তমান। যেমন হিন্দু যুগের শ্যামসেনের থামে আমের ছবি। সেকেন্দার শাহ নির্মিত আদিনা মসজিদ, পীর জালালউদ্দিন তাবরেজী নির্মিত জামে মসজিদের স্থাপত্যে আমের ছবি লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিউ-এন-সাঙ থেকে আবুল ফজল, পাশ্চাত্যের বার্নিয়ে থেকে লা-ব্লু প্রমুখ জেলার আমের প্রশংসা করেছেন। তবে মুঘলদের বাদশাহী হাতে আমের ক্রমোন্নতি ঘটে। সম্রাট বাবর আমকে বলতেন 'পৌর-ই-হিন্দ'। আকবর বলতেন 'শের-ই-হিন্দুস্থান' অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সেরা ফল। আকবরের তৈরি করা একলাখী বাগানটি বর্তমান বিহারে অবস্থিত। শেরশাহে পরাজিত করে বাবর-পুত্র প্রায় ৯ মাস বাংলার প্রাচীন রাজধানী তথা মালদহের শেরশাবাদ পরগণর কেন্দ্রভূমি গৌড়ে অবস্থান করেন। তখন আমের সময়, গৌড় ভূমির সাজানো বাগান, সুসাদৃশ্য আম দেখে মুগ্ধ হোন হুমায়ূন। এই গৌড়কে আখ্যা দেন 'জান্নাতাবাদ।'

মালদহের বাণিজ্যিক ভিত্তিক আম চাষ শুরু হয় ১৮৬০ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দশক থেকে। সেই সময় আমবাগানের পরিমাণ কম থাকলেও প্রাচীন তুঁতচাষীরা আমচাষীতে রূপান্তরিত হতে থাকে ও তুঁত-জমি আমবাগান হতে শুরু করে। পুরনো সমীক্ষার রূপ গ্রাফ-লেখ বদলে যায়। সেই সুদীর্ঘ অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এই জেলার অর্থ বুনিয়াদ নির্ভর করে আমের উপর। জেলার মিশ্র জনজাতি সম্প্রদায়সমূহের সকলেই আম বাগান, আম চাষ ও আম ব্যবসা, আমজাত নানা উপকরণ তৈরি সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে নানাভাবে যুক্ত। এই জেলার আম জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মানুষের দৈনন্দিন ধর্মে-কর্মে, রুচিতে-রুজিতে, ভাতে-পাতে আম যেন একাত্ম হয়ে আছে। তেমনি লোক-জীবনের মন-মনন চর্চার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের জীবনচর্যা ও লোকসাহিত্যে একটা নির্দিষ্ট ঠাঁই পেতে বসেছে। আমকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে লোক-অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবাদ, লোকগান, গম্ভীরা, ধাঁধা, ছড়া প্রভৃতি। এই নিবন্ধে আলোচ্য বিষয় আম-কেন্দ্রিক প্রবাদ ও জেলার জনজীবন।

সন্ধান সমীক্ষা থেকে আম-কেন্দ্রিক প্রবাদ এই জেলা থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি তা বিশ্লেষণ করলেই জেলার জনজীবন কর্মসংস্কৃতি, অর্থনীতি আম চাষ ও তার আবহ চিত্র তুলে ধরা যাবে তা ক্রমানুসারে আলোচনা করা যেতে পারে। সারি সারি আমগাছ। চোখজুড়ানো সবুজ। একসময়ের শখের বাগানও বটে। জমিদার ও অভিজাতরা শখ করে তৈরি করতো আমবাগান। পরে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হয়েছে সমগ্র জেলা জুড়ে।

মাসটা ফাগুন। মৌমাছির মুখস্ত গুঞ্জরন শুনলে জানি বসন্ত এলো। কাঞ্চনের কাঁচা জৌলুস বিকশিত হয়। তখনি রবি ঠাকুরের কবিতা মনে পড়ে, "ফাল্‌গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল/ ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল"। আম-গাছে বোল আসে। সমগ্র আম বাগান মো মো করে ওঠে। বাতাসে ভাসে অন্য স্বাদের ঘ্রাণ। তবে এই বোল আসা নির্ভর করে অনেকটা আবহাওয়ার ওপর। শীতের শেষ কিন্তু, কুয়াশা থাকে হালকা। একটু উষ্ণতা বোধহয়। মানুষের মুখে তখন শোনা যায়:

২. আধা মাঘে
কম্বলকাঁধে ।

মাসটা মাঘ মাস। গায়ের কম্বল গা ছেড়ে কাঁধে ওঠে। উষ্ণতার পরশ আসে। তখন আম গাছের আগায় আসে মুকুল এর সংকেত। আম চাষীর ভাষায় মুখে 'ড্যাব' আসে। সেই সময় কুয়াশা বিহীন সুন্দর আবহাওয়া পেলে আমগাছ মুকুলিত হতে শুরু করে। আর ঘন কুয়াশা পড়লে সব মুকুল নষ্ট হয়ে যায়। আম চাষীর মাথায় পড়ে হাত:

৩. যত কুয়ো
আমের ক্ষয়।

আবহাওয়ার এই ফাঁড়া কেটে গেলে আম গাছে মুকুলে মুকুলে বিকশিত হয়। আম চাষি (বাড়িয়াল)-এর মুখে হাসি ফোটে। বলে -'হাড় ফেটে মুকুল এসেছে '। চাষীর মনে ফাগুনের উজ্জ্বলতা একাত্ম হয়। বাগানের প্রকৃতিতে থাকে একটা সম্মোহন। আপদ থাকেনা। কিন্তু প্রকৃতি কি শোনে কারো কথা। আপন মরজিতেই চলে। যদি বৃষ্টি হয়-সব মুকুল নষ্ট হয়ে যায়। আম হয় না। বছরটা বন্ধ্যা হয়ে যায়। অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি হয়। তাই শোনা যায়:

৪. ফাগুণের পানি আগুন

জলহাওয়ার সুবন্দোবস্ত হলে মুকুলে দানা আসে। তখন পৈচ্ছা (পশ্চিমা) বাতাসে মুকুল ঝরঝরে হয়ে ওঠে। আমের দানা পুরুষ্ট হয়। মাসটা চৈত্র। তখন আমের আয়তন লোক ভাষায় 'চৈতকোড়ালী'। সেই সময় লোক মুখে শোনা যায়:

৫. চৈতে তিত্তা
বৈশাখে মিঠ্‌ঠা।

বৈশাখ মাস গোপালভোগ আর হিমসাগর সহ গুঠি আম পাকতে শুরু করে। জেলার মানুষের জিভে তখন মিঠে স্বাদ আসে। শুরু হয় আম ভাঙ্গা। কেনাবেচা।

বাজারজাত করা। মানুষ দুই পয়সার স্বপ্ন দেখে। আসে আর্থিক সচ্ছলতা। সেই সচ্ছলতা ধরা পড়ে এই প্রবাদে:

৬. আম কালে ডোম রাজা।

জেলায় নিম্নবর্গের মানুষও স্বচ্ছভাবে দিন যাপন করে। অভাব-অনটন ছুঁতে পারে না। প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সেই থেকে যথেষ্ট উপার্জন করে। নিম্নবর্গের মানুষ ডোমও যেন এই মরশুমে রাজ মর্যাদা পায়। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী নয়। ক্ষণিকের জন্য। শুধুমাত্র আমের মরসুমে। তারপর 'যে-কার সেই' – যে যার অবস্থায় ফিরে যায়।

এই মরশুমে কোন মানুষের আর্থিক ঔদ্ধত দেখলে অনেকে মনে কষ্ট পায়। ঈর্ষা কিংবা কষ্টে বলে:

৭. আম ভইরা ভাত
না তো গাঁইড়ে হাত।

আম মরশুমে যত চাকচিক্য। আম ফুরালে ফাঁকা। অর্থশূন্য। তখন পাছায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়।

মালদার আমের জাত প্রকার অনেক। অনেক নাম। কোনটা সার্বজনীন। কোনটা মালদার নিজস্ব ভাষায়। আবার বেনামী অনেক আম আছে। এই বেনামী আাম জেলার ভাষায় -'জারুয়া গুঠ্‌ঠী' (জোরজ আম), অবহেলায় যে আম আলে জন্মায়, তার নাম 'আড়া জোলমা'। আমের রূপ-রঙ দেখেও নামকরণ করা হয়েছে, যেমন- বহু-ভুলানি, মোধু-চুসকি। আবার আয়তন দেখে নামকরণ করা হয়েছে বাতাসা গুঠ্‌ঠি, সুপারি গুঠ্‌ঠি। স্বাদ অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে, যেমন গোপালভোগ, খিরসাপাতি (হিমসাগর)। ব্যক্তি নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে যেমন- ফজলি, সীতাভোগ, লক্ষণভোগ, ফুনিয়া ইত্যাদি। মাস অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে আশনিয়া, শাওনিয়া, ভাদরিয়া। এমন অসংখ্য বিচিত্র নামের আম জেলায় দেখা যায়। সমস্ত স্বাদের আম মালদার জন জীবনের সঙ্গে পরিচিত। কালিয়াচকের গয়েশবাড়ি (সুজাপুর) এর কালাম খলিফা। আমের একশ খানা নাম দিয়ে এক সময় গান রচনা করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। একটি গানের কলি প্রবাদ রূপে মানুষের মুখে মুখে আজও ঘোরে:

৮. আমের মধ্যে দেখ টে ছুঁড়ি
নাকুয়া মোহনভোগ
খাইয়্যা-দাইয়্যা মোটা হৈল
মালদা জেলার লোক।

আম যত প্রকারের হোক না কেন, যে আমের জন্য এই জেলা দেশ-বিদেশের খ্যাতি অর্জন পেয়েছে তার নাম ফজলি। যেমনি রস তমনি স্বাদ, আয়তনও বটে। মন পেট দু-ই ভরে। তাই প্রবাদে শোনা যায়:

৯.	রসেবসে মজলি
	আমের মধ্যে ফজলি।

এই ফজলি নামকরণের মধ্যে একটি লোক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হল- মহানন্দা কালিন্দীর সঙ্গমস্থলের একটু দূরে নিমসরাই গ্রাম। বাস করত এক মুসলমান বিধবা রমণী নাম ফজলি ব্যাওয়া। তার একটা ভালো জাতের গুঠি আম গাছ ছিল। আর সেটি ছিল তার সহায় সম্বল। কিন্তু কৌশলে জমিদার গাছটিকে খাস করে নিলে তার মনে কষ্ট হয়। খোদার কাছে প্রার্থনা করে, তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। একদিন তার ঘরের পিছনে একটি আম চারা গজিয়ে ওঠে। তার যত্ন সেবা শ্রমে গাছটি কাষ্ঠল বৃক্ষে পরিণত হয়। এই বৃক্ষটি মালদায় ফজলি আমের মুল।এ গাছের নাকি সেই সময় চার আনা এবং আঁঠি দুয়ানা দামে বিক্রি হতো। সেই ফজলি ব্যাওয়ার নাম অনুসারে এই আম ফজলি নামে পরিচিত হয়।

প্রসঙ্গত ফজলি আম নিয়ে পান্ডবদের একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, রামচন্দ্র একসময় পৌন্ড্র দেশ অর্থাৎ বর্তমান মালদায় আসেন। সেখান থেকে যান ভক্ত হনুমান নিবাসে, টাল ভূমিতে। টালভূমি মহানন্দা নদীর উত্তরে। হনুমান রামচন্দ্রকে স্ব-পরিবারে কালিন্দ্রী নদীর তীরে এক আম বাগানে নিয়ে যান। আম খাওয়ান। আম খেয়ে আমোদিত রামচন্দ্র। শুরু করে 'আম কেলি'। আমের আকার চেহারা দেখে অবাক হন। এই বড় আমটি হল ফজলি।

আকারে ছোট। পাতলা আঁঠি। থোকায় থোকায় হয়। নামলা (শেষে পাকে যা) এই আমের ফলন বেশি। লোকজনকে দিতে, আত্মীয়তা করতে ভালো। তাই লোকে বলে:

১০.	ফুনিয়া -
	খায় গোটা দুনিয়া।

এই আমেও এক মহিলার নাম জড়িয়ে আছে। আকারে ছোট হওয়ায় ফজলির মতো খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি।

গোপালভোগ আম নিয়েও জনশ্রুতি আছে। মহাপ্রভু পুরী যাওয়ার পথে মালদায় কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সেখানে রুপ গোস্বামী (দবিরখাস) ও সকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামী)-র সাথে তাঁর পরিচয় হয়। গৌড়ের কুলদেবতা নাড়ু গোপালের ভোগ দিয়েছিলেন বাগানের আম দিয়ে। সেই আমের নাম হয় গোপালভোগ। আবার পথ-ক্লান্তিতে একসময় বিশ্রাম নিয়েছিলেন অধুনা ইংরেজবাজার শহরের বৃন্দাবনী আম গাছের নিচে। স্থানটি আজও ‘বৃন্দাবনী মাঠ’ নামে পরিচিত।

যে সব আম মাস অনুযায়ী পাকে তাদের নামও মাস কেন্দ্রিক। যেমন, শাউনিয়া (শ্রাবণ), ভাদ্রিয়া (ভাদ্র মাসে আম), আশ্বনিয়া (আশ্বিন মাসের আম)। আবার অনেক আম আছে যা কাঁচাতেই মিষ্টি লাগে, নাম কাঁচমিষ্টি/ কাঁচ্চামিঠা। কোন কোন আম কাঁচা পাকা উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। কিন্তু কিছু আম আছে কাঁচা অবস্থায় বেস টক, আবার পাকলে মিষ্টি লাগে। সে কথা শোন যায় এই প্রবাদে:

১১.	আশ্বিয়া কাঁচ্চাতে খাইসনা

পাক্কাতে পাইসনা।

আশ্বিনিয়া হলো আমের মধ্যে শেষ আম, তাই অনেকেই একে নামলা (যা দেরিতে পাকে) বলে। এ সময়ে প্রায় সব আম ফুরিয়ে যায় তাই আশ্বিনিয়াও দুর্লভ হয়ে ওঠে।

কাঁচা আম অনেকের পছন্দ। নুন, মরিচ, মশলা দিয়ে বেশ মজা করে খায়। জিভে (টা টা) শব্দ করে, দেখে পাশের জনের জিভে জল আসে। তখন বলে, বাপরে বাপ! :

১২. খাট্টা বাঘা ট্যাণ্ড
ছাঠ্ঠা ছাড়ে চ্যাটাং চ্যাটাং।

পাশের জন লোভ সামলাতে না পেরে চেয়েও বসে। চেখেও দেখে। দেখে বলে, ইস! :

১৩. আত্তা খাট্টা খায়
বাঘের গাঁইড়ে লাগাইলে
বাঘ চমকায়!

বড় আম কম ফলে। তাই সবাইকে দেয়া যায়না। ছোট হলে কথাই নেই। তাই হাতে হাতে দেয়া যায়। গ্রামীণ জীবন প্রায় একান্নবর্তী পরিবার। পাশে পরসি। কুটুম-বাটুম ভাগ বাটোয়ারা করে খেতে হয়। অনেক সময় আত্মীয়তা রক্ষা করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে ছোট আম দিয়ে সেই আত্মীয়তা রক্ষা করা হয়:

১৪. বাতাসা গুঠ্ঠি নাম
গোষ্ঠী পুষা আম।

বাতাসা গুটি। আকারে ছোট। হয় থোকা থোকা।তাই বছরে একবার হলেও আত্মীয়তা ঝালিয়ে নিতে এর জুড়ি নেই।

কিছু আম মিষ্টি ও সুগন্ধের জন্য বিশেষ পরিচিত। আবার কিছু আম আছে আটি খুব বড়। কিন্তু আমের গুদ্দা (শাঁস)পুরু। আঁশযুক্ত। সেইসব আম পাকলেও খাওয়া যায় না। কিন্তু আচার হয়। সেই কথা শোনা যায়:

১৫. ক্ষীরশাপাতি ক্ষীর স্বাদে
আচার হয় দিলসাদে।

ক্ষীরশাপাতি (হিমসাগর) মিষ্টি গুনে পরিচিত। কিন্তু দিলশাদ আকারে বড়। আমত্বক পুরু। আঁশ যুক্ত। আঁঠি শক্ত। আচার ভালো হয়।

আম পরিণত হলে গাছে পাকতে শুরু করে। একের পরে এক আম গাছ থেকে পাড়া হয়। তখন দরকার হয় গাছুয়ার (আমপাড়া শ্রমিক)। এই গেছো কাজ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। অনেকেই ডাল ভেঙে গাছ থেকে পড়ে প্রাণ হারায়। মজুরি কম। কোন সময় মজুরি পায়। আবার কোন সময় বিনিময়ে আম পায়। খুব যত্ন করে আম পাড়তে হয়। শ্রম বিনিময়ের আমগুলো- পাকা, ফাটা, ক্যাট (ছোট অচল আম)। আর আম না দিয়ে শুধু আম পাড়ার মজুরি দিলে আম ব্যবসার ভাষায় বলা হয় 'শুখ্‌খা'। আম ভাঙতে গিয়ে পাকা আম পেলে গাছুয়া কত খুশি হন:

১৬. পাক্কা পাইলে খুশি

গাছুয়ার জালা টুসি।

মালদায় বাস করলেও অনেকেরই আমবাগান নেই। হতদরিদ্র মানুষ ক্রয়-ক্ষমতাও তেমন নেই, ঝড় জলে গাছ্ পড়া আম কুড়িয়ে খায়। আর আম ভাঙার সময় গেছোদের চোখ এড়িয়ে যে আম গাছে থেকে যায় বা কোন কারণে পাড়তে পারে না এই আমগুলিকে বলে ছুট আম বা গাছ্-বাড়ান আম। সে আম পাড়ার জন্য হতদরিদ্র গ্রামীণ ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। সেই চিত্র পাওয়া যায় প্রবাদে:

১৭. ছুট পাড়তে ছুট
ফুলফুলানিতে উঠ।

আবহাওয়ার সাথে ফলনের একটা সম্পর্ক আছে। ঝড় জলে কেটেছেঁটে ও যত আম হয় তার এক আনা পরিমানও যদি টিকে যায় তবে আমের আমদানি হয়। চাষীরাও খুশি হয়। খেয়ে-দেয়ে বেচে-কিনে লাভের মুখ দেখে। কথায় আছে :

১৮. আমের আনা মাছের পাই
যদি হইয়্যা যায়
কে কাত্তা খায়।

আমের যত মুকুল হয় তার ষোল আনার মধ্যে এক আনাও যদি টিকে থাকে গাছের বহন ক্ষমতা থাকেনা। আশানুরূপ আম হয়। গাছের ডাল নুয়ে যায়। তখন মালিক বা বাড়িয়াল গাছে চাঁড়া বা ঠেকো দেবার ব্যবস্থা করে। না দিলে ডাল ভাঙার সম্ভাবনা থাকে। যে বছর আম আসেনা, সেই বছর চাষীর মন খারাপ হয়ে যায়। শূন্য বাগান ঘুরে ঘুরে দেখে। তখন কেউ ব্যঙ্গ রসিকতা করে বলে- 'চাড়া দিবি না হে? তখন বাড়িয়াল (বাগানমালিক) বাঁকা মুখ দিয়ে বলতে শোনা যায়:

১৯. চাঁড়া লাগাবো
না বাঁড়া লাগাবো

আমবাগানগুলো পাতাতেই বিক্রি হয়। আগামী দু-তিন বছরের লিজ হিসেবে কিনে নেন ব্যবসায়ীরা। মালদাহের আম বিক্রির ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে ***Fruit Growing in India*** **গ্রন্থে: "An extreme illustration of the uneconomic nature of the contract system is provided by Gupta (1955) who states that, the mango crop in malda District is commonly sold three times, begining from the flowers, appear and ending just before harvest" (পৃ. ১০২-০৩)।**

বাগান পরিচর্যা করতে অনেক খরচ। মাটি খোঁড়া সাড় দেওয়া ইত্যাদি। এর জন্য শ্রম জন (লেবার) লাগে প্রচুর। তার বদলে একটা আশা ও গাণিতিক স্বপ্ন থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতির কাছে অসহায়। সেতো নিজের খেয়ালে চলে। ভালো তো ভালোই। মন্দ তো মন্দই। তাই আম ব্যবসাকে অনেকেই 'ঝুল্লা' (ঝুঁকি) বা ঝুলন্ত ব্যবসা বলে। যার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঝড়-বৃষ্টি, সুরুলি, নিপা ভাইরাসের থেকে বাঁচাতে না পারলে আমের সমূহ ক্ষতি হয়। লগ্নিপুঁজি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন বাড়িয়ালের মুখে শোনা যায়:

২০.	পুঁজি পাট্টা মাটি
পাছাই ঢুকল আঁটি।

মালিকের চোখে জল আসে। পুঁজি শূন্য হয়ে যায়। আমের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রকার কর্মসংস্কৃতির ক্ষতি হয়। জেলার আর্থিক বুনিয়াদ ধ্বসে পড়ে।

লোকবিশ্বাস ও লোক অভিজ্ঞতার একটি কথা হল, যে বছরে ভালো তেঁতুল আসে সে বছরে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা থাকে। এমন বানভাসিও হয়েছে বহুবার এই জেলার মানুষ। কারণ, নদী উপত্যকায় গ্রাম, শহরতলী গড়ে উঠেছে। বাড়িঘরের পুরনো ভিত দেখলেই তা বোঝা যায়। আর কথায় আছে "যেমন তেমন ঘর/ ভিটা উঁচ্চা কর"। এ বন্যারই সঙ্কেত। কিন্তু যে বছরে ভালো ধান হয়, সেই বছরে ভালো আমও হয়। সেই লোক-বিশ্বাসে শোনা যায়:

২১.	আমে ধান
তেঁতুলে বান।

ভালো আম হওয়ার সঙ্গে, ধান হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। ঠিকঠাক জলহাওয়ার যোগ হলেই ভালো ফসল হয়। মানুষের আবেগ ও স্বপ্ন পূর্ণতা পায়। স্বাচ্ছল্যের উজ্জ্বলতায় ভরে ওঠে দৈনন্দিন। স্বাভাবিক জীবনের গতিতে কোনো ছেদ পড়েনা।

কিন্তু আপদও আছে। জেলায় যে পরিমাণে আম আমতা আমসত্ত্ব আমচুর (আম-শুকনো) তৈরি হয়, তাকে আবার বাজারজাত করতে হয়। এই ব্যবসা রপ্তানি অনেকটা বাজার নির্ভর। কারণ, জেলার আম বিদেশে যায়। চাহিদা থাকলে দাম পায়, না থাকলে পায়না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমই একমাত্র ব্যবসা যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চুক্তি বিহীন। তাই অনেকটা বিদেশি চাহিদার উপর নির্ভর করে। তাই দাম পেলে কপাল ভালো, 'পাথরে পাঁচ কিল'। আবার গুজবের শিকার হলে, পানির দামে বিক্রি করতে হয়। তখন এ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বাড়িয়াল (মালিক) যোগানদার (পাহারাদার) গাছুয়া (শ্রমিক) টুকরি সেলাইকারী – সকলেই আর্থিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়। তাই একটি হতাশার চিত্র পাই এই প্রবাদে:

২২.	পানির দামে আম-আমতা
ভুখ্খা মরে আম জনতা।

আমের দাম থাকলে আমতারও দাম পাওয়া যায়। আমের দাম না থাকলে আমজাত সকল দ্রব্যের দাম কমে যায়। এক সমীক্ষা তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "ফারাক্কা ব্যারেজ যতদিন না হয় ততোদিন রেল পরিবহনে আম চালানের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। ব্যারেজ হওয়ার পর সড়কপথের পরিবহনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আম চালান হতে লাগলো"। আমের দাম না থাকলে আমতার দাম থাকেনা। কারণ পাকা আমের শাস দিয়ে আমতা তৈরি করা হয়। পাকা আম কে সেদ্ধ করা হয়। পাতলা সুতি কাপড় রৌদ্রে পেতে তার ওপরে পরতে পরতে দেওয়া হয়। শুকিয়ে গেলে কাপড় থেকে ছাড়িয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। তৈরি হয় আমতা বা আমসত্ত্ব। এই আমসত্ত্বের ভালো বাজার আছে। বিক্রি হয়। গ্রামীণ কুটির শিল্প হিসেবে চলে ভালো।

এই কর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকে বিশেষ করে ঘরের মহিলারা। বাণিজ্যিকভাবে যুক্ত থাকে পুরুষেরা।

কাচা আমেরও কদর কম নয়। আচার তৈরি হয়। ঘরের মহিলার এবং বাণিজ্যিকভাবে আচার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কারণ আচারের চাহিদা থাকে সারা বছর। তাই নানাপ্রকার আচার তৈরি করা হয় এই জেলায়। কখনো ছোকা (খোলাসহ) আবার কখনো ছোকা বিহীন, টক-ঝাল-মিষ্টি সল্টি, গ্রেভী, ইত্যাদি। কাঁচা আম কে টুকরো করে কেটে নুন মাখিয়ে ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর ভাপ দিয়ে হলুদ পাঁচ ফোরোং ও নানা মসলা ভিনিগার তেল দিয়ে মাখিয়ে বোয়াম জাত করে রৌদ্রে দেওয়া হয়। তারপর তৈরি হয় আচার। বাড়িতে তৈরি আচারেই সীমাবদ্ধ নয়। তৈরি হয়েছে আচার কারখানা। কারখানাগুলোতে কর্মে যুক্ত থাকেন প্রচুর মহিলা, পুরুষ শ্রমিক। এই কর্মের সাথে সারা বছর জড়িয়ে থাকে তাদের অর্থনৈতিক জীবন। তাই ঘরের মহিলাদের বলতে শোনা যায়-

২৩. ডুইব্যা আছি আচারে
গরম ভাতে তিন চারে।

সারাবছর আমের চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত কাঁচা আম কে খোসা ছিলে রোদে শুকানো হয়। ভালো করে শুকোলে একেবারে চুর্ মুর হয়ে যায়- একেই বলে আমচুর। পরে চাটনি হিসেবে বা রান্নার টক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই কাজে বেশ দক্ষ ঘরের মহিলারা। মহিলাদের মুখে শোনা যায় -

২৪. আরশি বিবির মুখ দেখনা
আর লাগেনা ক্ষুর
দাদো শুকনো আমচুর।

এখানে গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে গভীর মনস্তত্ত্ব। একদিকে অর্থ এবং দৈহিক বাসনা নিহিত। আরশি বিবির মুখের ধার তৈরি হয়। আবার ভোতা ও হয়। এটি স্বামীর অবস্থার উপর নির্ভর করে।

শুধু পাকা আম নয়। জনজীবনের খাদ্য তালিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমডাল, আম ছানা আম সরবত আমপোড়া আম খাটা আমতরকারি প্রভৃতি নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ কিছু তরকারি কাঁচা আম দিয়ে রান্না করলে তার মজাই আলাদা। এই আমযুক্ত রান্নাবান্নার বিশেষ কিছু ঢঙ এই জেলাতেই দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর-দক্ষিণে জেলাগুলিতে তেমন লক্ষ করা যায় না। জেলায় চৈত্র মাসে আমের দানা একটু বড় হলে ভাজা করে খাওয়া আরম্ভ হয়। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় আম কুড়ানো। বাজারে বিক্রি হয়। সেই আম কুড়াবার চিত্র:

২৫. পৈচ্ছা হাওয়ায় আম কুড়ালি
চৈতের চোত কোড়ালি।

প্রসঙ্গত আম কুড়াবার এই চিত্র খুঁজে পাই রবি ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় হতদরিদ্র উপেনের স্মৃতিচারণায়, "সেই জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের রাতে হয়নিকো ঘুম/ অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম" ।

সব আমই তরকারিতে ব্যবহার হয়। তবে পরিমাণ মতো। তরকারি হিসেবে ফজলি আমের ব্যবহার বেশি। না পেলে অন্য আম। কারণ ফজলি আম টক কম। কিন্তু জনজীবনের একটা উদ্ভুট রুচি থাকে। সেই রুচিতে আবার মজাও থাকে বেশ। সেই মজাদার তৃপ্তিময় উদ্ভুট একটি রুচির পরিচয় পাই এই জেলায়:

২৬. ল্যাংড়া আমের তরকারি
ভাদোই ধানের ভাত
সানকি ভরা পান্তা-জলে
নুন মরিচের সাথ।

জেলার হতদরিদ্র মানুষের খাদ্যাভ্যাস এর একটি চিত্র। এদের কপালে ফজলি জোটে না। গরম ভাত ও না। যা জোটে তাও আবার পান্তা! নিম্নমানের ধানের। পাত্র জোটেনি তাই সানকিতে নুন মাখিয়ে তৃপ্তি করে খেয়ে বেঁচে থাকে। এই জেলার হতদরিদ্রের এক বাস্তব ছবি।

কাঁচা আম শুকিয়ে যে আমচুর তৈরি করা হয় তা দিয়ে রান্না করা তরকারি বেশ স্বাদের, মজাদারও। পেটপুরে মন উজার করে থালা আঙুল চেটে খাওয়া যায়। সেই অঘ্রান মাসে। মিঠে রোদ দুপুরে। পাতে মাছের ঝোল। মাছ বলতে খোলসে ল্যাটা। সঙ্গে আমচুর। ভাবলেই জিভে জল আসে। খাদ্যাভ্যাসের এই লালা ক্ষরণ চিত্রটি:

২৭. খৈলস্য ল্যাটা আমচুরে
আঘ্‌ঘুনের ধূপ দুপ্‌পুরে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে আম প্রসঙ্গ এনে প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ জেলার মানুষের আম এতটাই অভ্যাসগত যে কোনো সহজ উপমা হিসেবে আম শব্দটি কে প্রয়োগ করেছেন। অনেক কথায় আমের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ধরে কথায় মারপ্যাঁচ তৈরি করেন। আবার রসালাপ ও করেন। শাসন তর্জনী ও আম শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। শব্দগুলি কখনও একটি ব্যঞ্জনা আবার কখনো উপমা বাগধারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে:

(ক). মাইরা আম রাস্‌সা বাহির কইরা দিব।
(খ). মুখটা শুকিয়্যা আমচুর হৈয়্যা গেছে।
(গ). দেখতেতো কুলি দাগ্নির মতন।
(ঘ). থোবনাটা তোর ন্যাঙড়া আমের মতোন।
(ঙ). দেখতে তো ফজিরর ভিটা।
(চ). কুণ্ঠেকার ধুমমা, দিলশাদ ইত্যাদি।

সমাজে চলমান জীবনচর্যার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আম-কেন্দ্রিক প্রবাদগুলো জন্মেছে নিরক্ষর মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে ছেলেরাই দুরন্ত হয়। মেয়েরা বেশ শান্ত স্বভাবের। তবে তাদের মধ্যেও যে-দস্যিপনা থাকে না তা নয়। গ্রামীণ শৈশবে মেয়েদের এমন চাঞ্চল্যতা দেখা যায়। লাফানো, ঝাপানো, গাছে ওঠা প্রভৃতি তাই লোকের ভাষায় শোনা যায়:

২৮. গাছ চড়ানি

আম পাড়ানি।

অনেকের জাত কুল বংশের একটা দুর্নাম থাকে। স্বভাবে ভুল থাকে। যা লোকে পছন্দ করেনা। কিন্তু তারই সন্তান সন্ততি বা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আচমকা একটা সুলক্ষণ দেখা যায়। যা সবাইকে অবাক করে। তখন লোক কথা শোনা যায়:

২৯. আমড়া গাছে আম

সমাজের চতুর ব্যক্তিরা নিজের আখের ও স্বার্থ গুছাতে থাকে। আর পাঁচজনকে বঞ্চিত করে সব কিছুকে নিজের ঝুলিতে নেয়। প্রাপ্য তো নেয় প্রাপ্য এর বাইরে ও কৌশলে আদায় করে নেন। সেই চতুর ব্যক্তির চতুরামির কৌশল উল্লেখ করে এই প্রবাদ:

৩০. গাছেরও খায়
তলারও খায়।
বা
কুড়িয়্যাও খা
পাইড়্যাও খা।

পরিবার সমাজের আত্মীয়তা থাকে সুমধুর। কিন্তু কখনো কখনো সেই সম্পর্কে চিড় ধরে। সেই চির খাওয়া ফাটল পুনর্নির্মাণ হয়। যে কারণে সম্পর্কের তিক্ততা আসে তার মাঝে এক তৃতীয় ব্যক্তিও থাকে। সে ঘটকের কাজ করে। সে খানিকের জন্যে সম্পর্কে ভাঙন ধরাতে পারলেও পরে সম্পর্কের সেতু ও কংক্রিট হয়। তখন তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা শুণ্য। অপ্রয়োজনীয় ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ে। সেই অভিজ্ঞতার কথা:

৩১. আমে দুধে মিশ্যা যায়
গুঠ্ঠি গড়াগড়ি খায়।

আটির মধ্যে যে বীজপত্র থাকে তা পিচ্ছিল। তা নিয়ে শিশুরা বুড়োরা মশকরা করে। দু আঙ্গুলে বীজ পত্রটি চেপে ধরে বলে, "কইন্যা রে কইন্যা, উমুকের বিহা কুনদিক?" যেদিকে বীজপত্র পিছলে যায় সেদিকেই। এমন করে খ্যাপানো ভাঙ্গানোর একটা চল গ্রাম্য সমাজে দেখা যায়।

গুটি গড়াগড়ি খেলেও এই জেলায় অর্থনীতিতে আমের আঁটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আমের আঁটিগুলিকে সংগ্রহ করে তা থেকে নতুন চারা গাছ তৈরি করা হয়। আবার চারা গাছ বেশ কিছুটা বড় হলে ভালো জাতের আম গাছের ডালের সঙ্গে কলম বাধা হয়। এই কলম তৈরিতেও জেলার সুনাম আছে। তৈরি কলমগুলি বাজারজাত করা হয়। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে কলমগুলো মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। লেগে গেলে তার লক্ষণ বোঝা যায়:

৩২. হওয়ার মতন গাছ
তো চিকন চিকন পাত।

গাছ্ লাগানোর পর মাটি ধরে গেলে তাকে মানব শিশুর মতোই সেবা পরিচর্যা করতে হয়। তবে গাছ্ বছ্রে বছ্রে বড় হয়ে ওঠে। তারপর তৈরি হয় একটা সুস্থ কাষ্ঠল গাছ্। সেই চিত্র পাওয়া যায়।

৩৩. মানুষ বাড়ে যাতে
গাছ্হাড় বাড়ে তাতে।

তারপর গাছ এক দু পাতা করে বড় হয়ে ওঠে। ডালপালা গজায় একদিন, পরিণত হয়ে ওঠে। ডালপালা ভরে যায় পাতা মুকুল কান্ডের বহরে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে বোঝা যায় গাছ্ -- গাছ্ হয়েছে। সেই লক্ষণের একটা দিনক্ষণ নির্ধারণ করেছে জেলার লোক ভাষা:

৩৪. মাঘের আট চৈতের আট
তারপর কাঠ।

মাঘের আট দিন গেলে মুকুল আসে। চৈত্রের আট দিনে ফলাফল দেখা দেয়। তারপরে গাছ্ গুড়ি তৈরি হয় অর্থাৎ এক পরিণতি গাছ্ তৈরি হয়।

প্রবাদগুলিকে নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়:

১. সংকলিত প্রবাদ গুলির বেশিরভাগই মালদা জেলার নিজস্ব প্রবাদ। তুলনামূলক বিচার করার মত তেমন কোনো সুযোগ নেই।
২. প্রবাদ গুলির মধ্যে জেলার অর্থনীতি খুঁজে পাওয়া যায়।
৩. এই আমকে কেন্দ্র করে আমজনতার বাস্তব জীবন চিত্র পরিষ্কার।
৪. আর্থসামাজিক চিত্র আছে এই প্রবাদ গুলিতে।
৫. মানুষের কর্মসংস্থান শ্রমশিল্পের ছবিটা উজ্জ্বল।
৬. আম এর মধ্যেও নানা প্রকার ভেষজ গুণ আছে। এই আভাস ইঙ্গিত মেলে একটি প্রবাদে, “খাইয়া-দাইয়া মোটা হৈল মালদা জেলার লোক”।
৭. নান্দনিকতা, ভাষা-ব্যকরণের দিক থেকে মালদার ভাষা রীতির নিজস্বতা আছে।আছে, বরেন্দ্রী তাল দিয়াড়ার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। চমৎকার অনুপ্রাস, উপমা, অলংকার। আছে কিছু ধ্বনীতাত্বিক বৈশিষ্ট্য।
৮. কিছু আঞ্চলিক শব্দও তৈরি হয়েছে, যেমন: ড্যাব (মুকুলের বোঁটা), নামলা (শেষ), বারিয়াল (আম মালিক), পাহারিয়া (পাহারাদার), সোরা লাগ্না (শুয়ো পোকা লাগা), সুনরিয়া লাগ্না (সিঁদুর রঙ লাগা), কুলি দাগ্নি (শিল পড়া দাগ) ইত্যাদি। তবে শব্দগুলি বিশ্লেষণ করলে প্রায় শব্দেরই কমবেশি একটা ব্যাকরণগত রূপ পাওয়া যাবে। আর কিছু শব্দ আছে একেবারে আঞ্চলিক।
৯. কিছু বস্তুকেন্দ্রিক নাম আমরা পাই এই চাষাবাদের উপাদান হিসেবে। উল্লিখিত প্রবাদ গুলির মধ্যে লগ্ঘা, ঠুসি, জালা, টুকরি ইত্যাদি।

মালদার আম জনজীবনকে বেশ রসালো ও সাধের করেছে। কখনো মিঠা তো কখনো টক্। সব মিলিয়ে একটা ছেদহীন ইতিহাস। আম শুধু এই জেলার

জনজীবনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে ধরেনি। বহু স্থানের নামকরণ হয়েছে আমের নামে। যেমন, বৃন্দাবনী মাঠ, আম-জাম তলা, আমঘাটা ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র:

মলয় শঙ্কর ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *মালদহ চর্চা ২* (প্রবন্ধ সংকলন), বঙ্গীয় প্রকাশক, ২০১২ । এই গ্রন্থে উল্লিখিত প্রবন্ধ:

১. অতুলচন্দ্র ঝা, "আম আঁটি থেকে শিল্প সম্ভাবনা"
২. কৃষ্ণলাল চৌধুরী, "কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী: উদ্দেশ্য ও উপকারিতা"।
৩. ডক্টর পুষ্পজিৎ রায়, "মুখ ও মুখোশ"।
৪. সমরেন্দ্র ধাড়া, "মালদহের আম ও তার ইতিবৃত্ত" ।
৫. সুস্মিতা সোম, "মালদা জেলার কুটিরশিল্প" ।

প্রবাদসূত্র:

১ নং প্রবাদ: ডক্টর পুষ্পজিৎ রায়, প্রাগুক্ত।
২ নং প্রবাদ: নিজস্ব সংগ্রহ।
৩ নং প্রবাদ: কৃষ্ণলাল চৌধুরী, প্রাগুক্ত।
৪, ৫, ৬ এবং ৭ নং প্রবাদ: নিজস্ব সংগ্রহ।
৮ নং প্রবাদ: ফারুক হোসেন, কবি ও শিক্ষক, ব্রহ্মত্তর, সুজাপুর, মালদা।
৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ নং প্রবাদ: নিজস্ব সংগ্রহ।
১৮ নং প্রবাদ: মোঃ বেলাল হোসেন, ব্রহ্মোত্তর, সুজাপুর, মালদা।
১৯ এবং ২০ নং প্রবাদ: নিজস্ব সংগ্রহ।
২১ নং প্রবাদ: বিদ্যুৎ দাস, ক বি ও শিল্পী, ফিনগর, কলেজপাড়া,পাকুয়া হাট, মালদা।
২২ নং প্রবাদ: এম আনোয়ারুল হক, সম্পাদক, *পুষ্পপ্রভাত*, শেরশাহী, কালিয়াচক, মালদা।
২৩ নং প্রবাদ: নিজস্ব সংগ্রহ।
২৪ নং প্রবাদ: ফিরোজ আলী আবির, শিক্ষক ও কবি, চৌদুয়ার, কোকলামারী, পুখুরিয়া, মালদা।
২৫ নং প্রবাদ: নিজস্ব সংগ্রহ।
২৬ নং প্রবাদ: ফিরোজ আলী আবির, প্রাগুক্ত।
২৭ এবং ২৮ নং প্রবাদ: নিজস্ব সংগ্রহ।
২৯ নং প্রবাদ: সাফিকুল আলম, কবি ও শিক্ষক, বুধিয়া, মালদা।
৩০, ৩১ এবং ৩২, ৩৩, ৩৪ ৩৫ নং প্রবাদ: নিজস্ব সংগ্রহ।
৩৩ এবং ৩৪ নং প্রবাদ: কৃষ্ণলাল চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

শেরশাবাদিয়া ভাষার লোকছড়া: অশ্লীলতার আয়নায় সমাজ ও নারী

মাসিউর রহমান

শেরশাবাদিয়া ভারতের অনেক মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। । 'শেরশাবাদিয়া' এই শব্দটা এসেছে 'শেরশাবাদ' শব্দ থেকে । 'শেরশাবাদ' একটি স্থান তথা পরগণার নাম। ব্যুৎপত্তিগতভাবে শেরশাবাদিয়া বলতে এই পরগনায় এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের তথা এদের ভাষাকে বোঝানো হলেও বর্তমানে শব্দটি এই পরগণার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসিলম কৃষক শ্রেণী বিশেষের জন্য ব্যবহৃত হয় (আব্দুল অহাব, "শেরশাবাদিয়া পরিচয়ের ইতিবৃত্ত")। শেরশাবাদিয়াগণের আদি ভূমি শেরশাবাদ হলেও জনবিস্তারের স্বাভাবিক নিয়মে এরা বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে (প্রাগুক্ত)। শেরশাবাদিয়া লোকসাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লোকছড়া। আমি এই নিবন্ধে শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত লোকছড়াগুলোর মধ্যে বাছাই করা দশটি লোকছড়া নিয়ে লিখবো যার ভাষার মধ্যে কমবেশি অশ্লীলতার একটা ছাপ রয়েছে। অশ্লীলতার আয়নায় এই ছড়াগুলোতে কীভাবে সমাজ-জীবন এবং তাতে নারীর অবস্থান প্রতিফলিত হয়েছে, সেটি এখানে আলোচনা করা হলো ।

শিরোনামে উল্লেখিত 'অশ্লীল' শব্দটার পরিভাষা হল যা এমন সব শব্দ, চিত্র ও কার্যক্রমকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যেগুলো সমসাময়িক অধিকাংশ মানুষের যৌন নৈতিকতার দৃষ্টিতে অপরাধ বা দোষ হিসেবে বিবেচিত। মেরিয়াম-ওয়েবস্টার অভিধানানুযায়ী, উক্ত শব্দটির মূল ইংরেজি শব্দ 'অবসিন' (obscene), যেটির ল্যাটিন শব্দ 'অবসেনাস'(obscenus) থেকে এসেছে, যার অর্থ দুষ্ট, ঘৃণিত, রুচিহীন। অশ্লীল শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো দুটি ইংরেজী শব্দ হলো 'স্ল্যাং' ও 'ভালগার'। এই 'অশ্লীল' কথাগুলো দেহকেন্দ্রিক অমার্জিত ও ব্যবহারে সীমাবদ্ধ । অশ্লীলতার সাথে জড়িয়ে থাকে যাবতীয় দৈহিকতা ও তার গোপনীয়তা। এই অশ্লীলতা জীবনের একটা বড় বিনোদন এবং পুরুষরা বেশি ব্যবহার করে থাকে। কখনো সরাসরি, কখনো ইঙ্গিতে, কখনোবা প্রতীকের মধ্য দিয়ে এই অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও কর্মে পৌরুষ অনুপ্রেরণা এবং শক্তি জোগানোর জন্য এই ধরণের ভাষা ব্যবহৃত হয়। তবে কাজিয়া-ঝগড়ায় মনের ঝাল মেটানোতে এই অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ মারাত্মকভাবে পরিলক্ষিত হয় পরস্পর বিরোধী সদস্যদের মধ্যে। এছাড়াও, শেরশাবাদিয়া সমাজে অভিশাপ-সূচক, নিষিদ্ধ, অশালীন, ঘৃনিত, বিরক্তিকর ও বর্বরোচিত মন্তব্য করতে এই ছড়াগুলোর প্রয়োগ ঘটে থাকে।

এবার, ছড়া সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাদের অক্ষর জ্ঞান অর্জনের বহু পূর্ব হতে মুখে মুখে উচ্চারিত স্মৃতিবদ্ধ ছান্দসিক যে কবিত্ব প্রকাশ তাই আমাদের কাছে লোকছড়া। প্রাচীন যুগে লোকছড়া সাহিত্যের মর্যাদা না পেলেও বর্তমানে সে তার প্রাপ্য সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মনোহরি এবং সামাজিক প্রভাব বিবেচনা

করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘ বিজ্ঞান শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভাল করিয়া ধরা দেই নাই। অথচ জড় জগতে ও মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃংখল অদ্‌ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে" (পৃষ্ঠা ৬০৮)।

ছড়ার প্রকার প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তার *বাংলার লোক সাহিত্য* গ্রন্থে ছড়াকে লৌকিক ছড়া, সাহিত্যিক ছড়া ও আধুনিক ছড়া এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন (পৃষ্ঠা ১৩৪)। এছাড়াও ছড়াকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা হয়। যেমন, শিশুতোষ ছড়া, রাজনৈতিক ছড়া, অশ্লীল ছড়া, ছড়ার ছন্দাশ্রিত কিশোর কবিতা প্রভৃতি। এর মধ্যে শিশুতোষ ছড়া তৈরি হয় কেবলমাত্র শিশু-মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখানে সমাজে প্রচলিত প্রাপ্তবয়স্কদের ছড়া অর্থাৎ অশ্লীল ছড়া এবং এই অশ্লীল শব্দে গড়ে ওঠা ছড়ায় কীভাবে সমাজজীবন চিত্রিত হয়েছে এবং এই চিত্রিত সমাজে নারীদের অবস্থান কী – এ বিষয়ে দশটি ছড়ার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হল।

১. মাছ খ্যাবা ট্যাংরা
ভাতার লিব্যা চ্যাংড়া।

'ভাতার লিব্যা চ্যাংড়া' ছড়াটির এই লইনটি যৌনগন্ধ সমৃদ্ধ এবং অশ্লীল হয়েছে। এখানে ভাতার বলতে স্বামী অর্থাৎ যে একটি যুবতী মেয়ের ভাত-কাপড় ও শারীরিক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব নেয়। সে যদি চ্যাংড়া অর্থাৎ উঠতি বয়সী যুবক ছেলে হয়, তাহলে শারীরিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং তার পাশাপাশি ভাত-কাপড়ের দায়িত্বও ঠিকঠাক পালন করবে। এখানে মেয়েরা এই রকম যুবক পেয়ে তৃপ্ত হলেও সমাজে মেয়েদের পরনির্ভরশীলতাই ফুটে ওঠেছে। অন্যদিকে ট্যাংরা অর্থাৎ টেংরা মাছ ঘনো ঝোলে রান্না করে গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ। এখানে শেরশাবাদিয়াদের প্রিয় খাবার টেংরা মাছ এবং গরম ভাত, সে চিত্র সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে।

২. ভাতারের ভাত খাই
নাঙের পায়ে তেল মাখায়।

এখানে ভাতারের পাশাপাশি নাঙ্ শব্দটি থাকায় ছড়াটি অশ্লীল হয়েছে। ভাতার বলতে বৈধ স্বামী কে বোঝানো হয়েছে, নাঙ্ বলতে বৈধ স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে বুঝানো হয়েছে যার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখা হয়। এই ছড়াটিতে নারীর চরিত্রহীনতার কথা ফুটে উঠেছে। কিন্তু স্বামী অথবা নাঙের পায়ে তেল মাখানোর প্রসঙ্গটিতে নারীকে পুরুষের সেবাকারী এবং যৌনবস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে নারীর সম্মান বিসর্জিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিকতার বহিপ্রকাশ এই ছড়াট।

৩. মাগি ওঠে গাছে
হুলা বিলায় লাছে।

এই ছড়াই একজন পুরুষ গাছে উঠবে এতে কোন সমস্যা নেই। তা কারো কাছে বেমানান বলে মনেও হয় না। কিন্তু একজন নারী যখন গাছে ওঠে তখন সমাজের চোখে তা ব্যতিক্রমী। তা এতোটাই অস্বাভাবিক যে সেই দৃশ্য দেখে হুলো বেড়াল হাসে, গায়, নাচে। এখানে বিড়াল কে তুচ্ছ প্রাণী বলে প্রকাশ করেছে। এই সামান্য বিড়ালটা মেয়েদের গাছে আরোহণের অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে নাচতে শুরু করে।আবার হুলো (হোল বা অণ্ডকোষ যুক্ত) বিড়াল এখানে পুরুষের প্রতীক হতে পারে, অর্থাৎ এমন উদ্ভুণ্ডালী নারীর অবৈধ সঙ্গ পেতে হুলো বিড়ালের মতো একজন কামুক পুরুষও গাছে উঠতে পারে কিম্বা নাচ বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আকৃষ্ট করতে পারে। এখানে নারীকে বাড়ির বাইরে পুরুষের মতো কাজকর্ম করাকে ভালো চোখে নেওয়া হয় না। শেরশাবাদিয়া নারীরা সাধারণভাবে বাড়ি থেকে দূরে জমিজায়গা ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্মে যুক্ত হন না বা হতে দেয়া হয় না, যদিও আজকাল চাকরিবাকরিও করছে নারীশিক্ষার হার বাড়ার কারণে। এই ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমাজ পুরুষতান্ত্রিক।সমাজে পুরুষরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। শুধু নারীর বেলায় বাধা-নিষেধ।

৪. গরু বান্ধো আঁইট্যা
বেটিছ্যালাকে মারো খুঁইট্যা।

ছড়াটিতে অশ্লীলতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ নয়। অশ্লীলতা রয়েছে নারীদেহের উপর পুরুষের যৌন-নিষ্ঠুর যথেচ্চারের মধ্যে। এখানে বেটিছাল্যা মানে নারীকে বোঝানো হচ্ছে যাকে গরুর চাইতেও হীন বিবেচনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে গরুকে শাসন এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেই হয়। কিন্তু নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাকে আঘাত করতে হয়। এই আঘাত আবার হাত বা ছড়ি দিয়ে নয়, খুঁটির মত শক্তপোক্ত মোটা কিছু দিয়ে আঘাত করার কথা বলা হচ্ছে। এই ছড়া থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মেয়েদেরকে অবদমিত করে রাখার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছে এই ছড়ার সমর্থক। অবশ্য এই ছড়ার মধ্য দিয়ে সব শেরশাবাদিয়া পুরুষকে বুঝানো উচিৎ নয়।এখানে অশিক্ষিত, অসভ্য ও বর্বর মানসিকতার পুরুষরাই এই ধরণের ছড়ার আবিষ্কারক।

৫. জা'র গু গায় গায়
ননদের গু গুন্ধায়।

এই ছড়াটির মধ্য দিয়ে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের কথা পাওয়া যায়। এই পরিবার শশুর-শাশুড়ি দেবর-ভাসুর এবং তাদের সন্তানসন্ততি নিয়ে বহু সদস্যে গড়া। যেখানে জা বলতে ভাসুর বা দেওরের বউকে বুঝিয়েছে, ননদ হল স্বামীর বোন। গু মানে বিষ্ঠা, যা এই ছড়ায় গুণাগুণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ছড়ায় যে পরিবারের কথা পায় তা পুরুষশাসিত। সেখানে মেয়েরা বাবা বা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল।

বাবার বাড়িতে মেয়েরা কিছুটা স্বাধীন থাকলেও, শ্বশুরবাড়িতে পরিবারের সদস্যদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। তাই শ্বশুরবাড়িতে ননদের স্বাধীনতা দেখে, জায়েদের মনে জ্বলন হয়। পরিবারে ননদের দাপটে জা অর্থাৎ ভাবীরা অসহায়ত্ব বোধ করে। ফলে নিজেরা সংঘটিত হয় ননদের বিরুদ্ধে, নিজেদের পারস্পরিক দোষগুলোকে সুগন্ধি হিসেবে নিজেদের গায়ে মখে। অন্যদিকে ননদের দোষগুলো গু অর্থাৎ পায়খানা বা ময়লা মনে হয় যেখান থেকে দুর্গন্ধ বা রোগবালাই বা সমস্যা বা অশান্তির সৃষ্টি হয়। যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারে ঝগড়া-কলহে ও ভাঙ্গনে নারীদের ভূমিকা এই ছড়াটির মধ্য ধরা পড়েছে।

৬. বহু ক্যাইল্যা
আইব্যারি শালা সমন্দির ব্যাটা।

এই ছড়ায় শেরশাবাদিয়া শব্দ বহু বলতে বউ, আইব্যারি মানে ঘটক বুঝায়। শালা-সমন্দি বলতে বউয়ের ভাইকে বোঝায়।ছড়াটিতে সমাজের প্রতারণার ছবি চিত্রিত হয়েছে। পাত্রপক্ষ যখন বউ দেখতে যাই তখন সুন্দর ফর্সা মেয়ে দেখানো হয়। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর ঘটকের কুবুদ্ধিতে পাত্রী পরিবর্তন ক'রে কুদর্শী মেয়েকে পাঠানো হয় পাত্রী হিসাবে শ্বশুরবাড়ি। এভাবে পাত্রপক্ষ প্রতারিত হলে, তারা ঘটককে "শালা-সমন্দির ব্যাটা" বলে গালি দেয়। এখানে 'শালা-সমন্দি' অর্থাৎ 'স্ত্রীর ভাই বা দাদা' – এই কথাগুলোর মাধ্যমে ঘটকের বোনকে বিবাহ না করেও তাকে স্ত্রী হিসাবে ধরে নেওয়ার মধ্যে এক অশ্লীলতা প্রকাশ পাচ্ছে। এইভাবে ঘটকের বোনকে ছোট করা হলো।

এখানে ঘটকের শঠতা ও বিয়েতে একটি মেয়েকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। বিবাহযোগ্য অসুন্দরী কনেদের বেদনাদায়ক জীবন-পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার করুন পীড়াদায়ক সামাজিক যন্ত্রণাও ফুটে উঠেছে এখানে।

৭. বেটি মোড়ল
মিনস্যা গাঁড়োইল।

প্রথম লাইনটিতে অশ্লীলতার কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় লাইনটিতে মিনস্যা শব্দটির ব্যবহারে ছড়াটি অশ্লীল হয়েছে। বেটি মানে মেয়েদের বুঝিয়েছে, মোড়ল মানে যারা সমাজে হর্তাকর্তা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। মিনস্যা মানে পুরুষদের বোঝানো হয়েছে। গাঁড়োইল মানে গাধা নামক জন্তুকে বুঝিয়েছে। ছড়াটি আলোচনা করলে যা দেখা যায়, তা নারীর জন্য অসম্মানজনক। অনুমান করা যায় পুরুষ-ভাবনা থেকেই এই ছড়াটির উৎপত্তি যেখানে মোড়লিপনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে কেবল পুরুষের, নারীর নয়।যদি কোন সমাজ-সংসারে নারী হর্তাকর্তা হন, তাহলে সেখানে পুরুষের অবস্থাটি গাধার নামান্তর। এখান থেকে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক অবস্থানটা ফুটে উঠেছে, যেখানে মেয়েরা সম্মানিত নয়।

৮. আদর কৈর‍্যা বহু কাঁঠাল না খায়
সেই বহু কাঁন্টাই যায়্যা ভূঁতি চাঁটাই।

এই ছড়াটি পুরোটাই অশ্লীল এবং ভীষণ কাব্যিক। এখানে ‘কাঁঠাল না খায়’ অর্থাৎ “পাকা কাঁঠলের কোয়া খায় না” এবং ‘ভুঁতি’ বলতে কাঁঠালের কোয়া ধারণকারী হলুদ রঙের নরম মোটা ও চ্যাপ্টা সুতার মত অংশ বা আঁশগুলোকে বুঝায়। বহু বলতে বউকে বুঝিয়েছে, যে বউ স্বামীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে চায় না। নিজের স্বামী রেখে পরপুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে চায়। এখান থেকে বোঝা যায় ওই স্ত্রীটির চারিত্রিক দোষ আছে।

কিন্তু অন্যভাবে ব্যাখা করলে দাঁড়ায়, সেই মেয়েটি বিয়ে হওয়ার আগে কাউকে যদি ভালোবাসতো, সেই ভালবাসার সাথে তার বিয়ে না দিয়ে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে তার সংসারে মন নেয়। মনটি তার ভালবাসার পাত্রের কাছে পড়ে আছে। এ থেকে বোঝা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি তাদের বিয়েতেও। এর ফলে সমাজে অনেক অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং অনেক সংসার ভেঙেও যায়।

৯. দু’খান ঠ্যাং ফাঁক কৈর‍্যা
মাঝ বরাবর চাপ দিয়্যা
পঁচপঁচানি কাম সাইরা
দিলা সেই চাপনের চাপ।

এই ছড়াটি যৌনকর্মের পর্ণোগ্রাফিমূলক প্রকাশ। এই প্রকাশের আড়ালে অবশ্য ভাল অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। এর বিশ্লেষণ খুব একটা দরকার নেই, সহজেই অনুমান করা যায়। এটি একটি যাঁতিতে সুপারি কাটার দৃশ্য। এ থেকে বোঝা যায়, সমাজে রসিকতার ছলে রসিক মানুষদের হেঁয়ালিপূর্ণ ছড়া এটি। এগুলোকে শেরশাবাদিয়া ভাষায় ফোষ্টি (riddle) বলা হয়। তবে এই বর্ণনায় পুরুষ-প্রতীকে যাঁতি ও নারী-প্রতীকে সুপারি বঝানোর মধ্য দিয়ে নারীকে হেয় করে ও ভোগ্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে এবং পুরুষকে ভোগীরূপে বাহবা দেওয়া হয়েছে।

১০. ভাতার গ্যালো নাঙ্ গ্যালো
আলু বেচ্যা ফাল হৈলো।

ভাতার মানে স্বামী, নাঙ্ মানে পরপুরুষ, ফাল মানে লাঙলের ফলা। মেয়েটি পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক রেখেছে, তাই তার স্বামী রাগে তাকে ছেড়ে পালিয়েছে। মেয়েটি নিজের শখ বা আরামের জন্য আলু চাষ করেছিল, সেটা বিক্রি করল। কিন্তু তার নাঙ্ অর্থাৎ অপর পুরুষটি ভালো বা দায়িত্বশীল নয়। সে টাকার লোভে সম্পর্ক রেখেছিল। এখন তার সেই টাকা নিয়ে সেও পালিয়ে গেল। ফলে তার জীবনে দুঃখ নেমে আসলো যেটা বিদ্রুপাত্মক ভাবে লাঙলের ফলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে মেয়েকে দুশ্চরিত্র প্রমাণ করলেও ছেলেরাও ধোয়া তুলসী-পাতা নয় অর্থাৎ তারাও চরিত্রহীন ও দুষ্ট।

উপরোক্ত ব্যবহৃত ছড়াগুলির প্রত্যেকটিতে এক বা একাধিক অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্মণীয়। কিন্তু ছড়াগুলো আংশিক না পুরোপুরি অশ্লীল, তা বিতর্ক ও

মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ব্যক্তির কাছে কোনটি অশ্লীল এবং কোনটি শালীন তার ধারণা ভিন্ন হয়ে থাকে। তাছাড়া সময়ের সাথে সাথে অশ্লীল হিসেবে বিবেচিত বস্তুর সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়। একটি সময়ে অশ্লীল হিসেবে বিবেচিত বিষয় অপর এক সময়ে আর অশ্লীল বলে গণ্য হয় না। তবে অঞ্চল, আঞ্চলিক ভাষা এবং কাল-পাত্র-ভেদ থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে বোধগম্য প্রমাণ-সাপেক্ষে অশ্লীলতার বিষয়টা ধরার চেষ্টা করেছি এখানে। এই চেতনায় তাড়িত হয়ে দশটি ছড়া এই লেখার অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলোতে সমাজজীবন ও নারীদের অবস্থান দেখানোর প্রয়াস পেয়েছি।

তথ্যনির্দেশিকা:

১. আবদুল অহাব, "শেরশাবাদিয়া পরিচয়ের ইতিবৃত্ত," *www.shershabadia.xyz*

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কোলকাতা, ১৪১৭ (বঙ্গাব্দ)

৪. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক সাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬২

৫. "Obscene." *http://www.merriam-webster.com/dictionary*

প্রবাদ-সংগ্রহ: ক্রমানুযায়ী

১. কাজী নাজির হোসেন, মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, পিতা: শিশ মোহাম্মাদ, ভাদো, সামসি, মালদা
২. মতিউর রহমান, শিক্ষক, পিতা: কাইয়ুম, বালুয়াঘাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা
৩. লিয়াকত আলী, কৃষক, জগন্নাথপুর, মালদা
৪. মোহ. আলাউদ্দিন, গৃহশিক্ষক, ছঘরিয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা
৫. তারিকুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক, করকরিয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা
৬. ডা. জাকির হোসেন, ডাক্তার (কোয়াক), পিতা: আমজাদ হোসেন, তালগাছি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা
৭. রুহুল আমিন, ছাত্র, পিতা: মোহ. জালালুদ্দিন, তালগাছি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা
৮. মোহা. মাইনুল হক, মাদ্রাসা শিক্ষক, সম্বলপুর, পুখুরিয়, মালদা
৯. উজির আলী, শ্রমিক, তালগাছি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা
১০. রফিকুল ইসলাম, টিউশন টিচার, বৃধিয়া, মালদা

সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

অধ্যাপক অলিউল্লাহ

মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং দীর্ঘদিন ধরে সমাজের মধ্যে একে অপরের সাথে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও আচরণ লক্ষ্য করা যায়, সমাজের সদস্যদের মধ্যে কিছু অলিখিত নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ধারা, ভাষা, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা এবং সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে আমরা সংস্কৃতি বলে থাকি যার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে যা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্ম হস্তান্তরিত হয়। সংস্কৃতি হলো একটি অদৃশ্য বন্ধন যা জাতির সদস্যদের একত্রিত করে। সমাজ এবং সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল, যুগের সাথে সাথে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা বিগত দিনের সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। যা পরবর্তী দিনে আমাদের পথ চলাকে সুগম করবে। তাই কোনো জাতির সংস্কৃতি বুঝতে হলে সেই জাতির ইতিহাস জানা খুব জরুরী। সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার।

সংস্কৃতি বা culture শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন ভাষার শব্দ "cultura" থেকে যার অর্থ হলো cultivation and growing অর্থাৎ চাষাবাদ বা পরিচর্যা করা এবং বিকশিত হওয়া। culture শব্দটি কোন বস্তু বা জীবের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া ও লালন পালন করাকে বোঝায়। যেমন Agri-culture অর্থাৎ চাষবাস, Horti-culture অর্থাৎ উদ্যানপালন, aqua-culture অর্থাৎ জলজ পালন ইত্যাদি। ঠিক তেমনই সংস্কৃতির মানে হল দীর্ঘদিন ধরে কোন সমাজের মধ্যে গড়ে ওঠা রীতি রেওয়াজ এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে কালচার অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে বোঝায়: "The customs and beliefs, art, way of life and social organisation of a particular country or group" পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো দেশের বা কোনো জনগোষ্ঠীর রীতি-রেওয়াজ, আস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-দর্শন, শিল্পকলা, কৌশল, দক্ষতা, ভাষা, পোশাক-আশাক, খাদ্য-অভ্যাস, চিন্তাধারা ও জীবনধারা ইত্যাদিকে সংস্কৃতি বলা হয়। সংস্কৃতি একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তার পরিচয়। যেমন একজন ব্যক্তির জীবনে তার ব্যক্তিগত পরিচয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই পরিচয় ছাড়া সে সমাজের মধ্যে বাঁচতে পারে না। চাকরি-বাকরি, শিক্ষা, টাকা পয়সা সবকিছু থাকা সত্ত্বেও যদি তার কাছে নাম ঠিকানা, তার বাবা মার পরিচয়, বংশ পরিচয় না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি পরিচয় সংকটে ভোগে এবং সমাজের মধ্যে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়। তেমনি একটা সম্প্রদায়ের নিজস্ব পরিচয় থাকে যেই পরিচয় ছাড়া সেই সম্প্রদায় কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। কোনো সম্প্রদায়ের পরিচয় জানতে হলে তার সংস্কৃতি ও ইতিহাস জানা খুব জরুরী। কোনো সম্প্রদায়ের

অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তার পরিচয়কে অক্ষত রাখা অত্যন্ত জরুরী। এই পরিচয় বিলুপ্ত হলে সেই সম্প্রদায় পরিচয় সংকটে ভুগে এবং তার অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হয়। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে এই পরিচয় সংকটের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

বিহারের শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়গণ শতাব্দীকাল ধরে সেখানে বসবাসকারী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক শক্তি এই জনজাতিকে বাংলাদেশী আখ্যায়িত করে হয়রান করার চেষ্টা করে। বিহারের কাটিহার বিধানসভার তৎকালীন এম.এল.এ. জনাব মোবারক হোসেন সাহেব ১৯৮২ সালে "All Bihar Shershahbadi Association" নামক একটি সংগঠনের স্থাপনা করেন এবং আন্দোলন শুরু করেন, যার ফলে বিহার সরকার তথা ভারত সরকার পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠী স্বীকৃতি প্রদান করে এবং অনগ্রসর শ্রেনীর (O.B.C.-এর) অন্তর্ভুক্ত করে।

অন্যদিকে আসামে জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (NRC) তৈরি করার সময় নাগরিকত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত সম্প্রদায় গুলিকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয় যারা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পেরেছে যে তারা সেই রাজ্যের ভূমিপুত্র এবং আদিবাসী জনজাতি। অন্য দিকে অসংগঠিত বাঙালিগণ হয়রানির শিকার হয়ে চলেছে সেখানে।

সংস্কৃতি সম্প্রদায়ের সদস্যদের একটি অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের মধ্যে একতা গড়ে। সংস্কৃতি চর্চার ফলে জাতির প্রতি একটি মনের টান তৈরি হয় যা সেই সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দদের সম্প্রদায় কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একটা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি রাখার ক্ষেত্রে এটা প্রমাণ করতে হয় যে সেই সম্প্রদায় বাস্তবে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা এবং তাদের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে, এই সমস্ত জিনিস সরকারের কাছে প্রমাণ করতে হয়। তারপরই কিন্তু সেই সম্প্রদায় বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়, যেমন শিক্ষা-দীক্ষা এবং চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, ওই সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন প্রকল্প ইত্যাদি। এবং উপরোক্ত দাবিগুলি কে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের প্রয়োজন যা ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা ছাড়া সম্ভব নয়।

ইতিহাসের মাধ্যমেই একটি সম্প্রদায়ের অতীতকে বোঝা যায়, যা ঐ সম্প্রদায়ের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে ওঠে। একটি সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন বা অবনতি খতিয়ে দেখার জন্য সেই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং ইতিহাস জানা খুবই জরুরী। উন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির রহস্য এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবনতির কারণ সমূহ খুঁজে বের করার জন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, জীবনধারা এবং ইতিহাস জানা অপরিহার্য। কোনো সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি না বুঝে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

কোনো নির্দিষ্ট জাতি যদি নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে ব্যর্থ হয় তাহলে বিশ্বের অন্যান্য প্রভাবশালী জাতি তাদের উপর আধিপত্য জমাবার চেষ্টা করে; এর ফলে শুরু হয় সাংস্কৃতিক দাসত্ব। জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) বা ইউনেস্কো (UNESCO) সংস্কৃতি সংরক্ষণের গুরুত্বকে খুব ভালোভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে, ১৯৬৬ সালের

“Declaration of Principles of International Cultural Co-operation” ঘোষণার এক নম্বর অনুচ্ছেদের মধ্যে ইউনেস্কো বলেছে: “Each culture has a dignity and value which must be respected and preserved. Every people has the right and the duty to develop its culture” (অর্থাৎ, “প্রতিটি সংস্কৃতির একটি মর্যাদা ও মূল্য রয়েছে এবং সেটিকে সম্মান করা এবং সংরক্ষণ করা জরুরি। নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ সাধন প্রত্যেকটা ব্যক্তির অধিকার এবং কর্তব্য”)।

যে সমস্ত জাতি নিজেদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ করেনি তারা আজ ইতিহাসের পাতা থেকে এবং বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে। তাই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ করতে হবে।
এবারে আমি বিষয়বস্তুর দ্বিতীয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সংস্কৃতি চর্চা করা এবং জাতিগত পরিচয় সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। অনেকেরই ধারণা রয়েছে যে ইসলাম সংস্কৃতি এবং জাতিগত পরিচয় বিরোধী কিন্তু বাস্তবে ইসলামের মধ্যে এরকম কিছুই বলা হয়নি বরং জাতিগত পরিচয় এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণের প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করেছে। জাতিগত পরিচয় একটি প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সে কথা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে বলেছেন:

> হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং নারী থেকে, এবং আমি তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি এবং গোষ্ঠীতে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারো, তবে তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে ব্যাক্তি অধিক ন্যায় কর্ম-পরায়ন; নিশ্চয় আল্লাহ (সবকিছু) পরিজ্ঞাত ও সুক্ষ বিষয়েরও খবর রাখেন (সূরা হুজুরাত: ১৩)।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে মূলত দুইটি বিষয় আলোচনা করেছেন; প্রথমটি হল যে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী এবং গোত্রের বিভাজন -- এটা আল্লাহ তায়ালা নিজেই করেছেন এবং এটা প্রাকৃতিক; আয়াতের মধ্যে “جعلناكم” শব্দ এসেছে যার অর্থ হচ্ছে “আমি (আল্লাহ তায়ালা) এই বিভাজন করেছি”। এবং পরবর্তী অংশে তার কারণও স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করেছেন, সেটি হল আইডেন্টিটি বা পরিচয় যেটা একটা জাতির জন্য খুবই জরুরী। দ্বিতীয় যে কথাটি আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতের মধ্যে বলেছেন সেটি হচ্ছে যে এই জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো ধরণের বৈষম্য হবে না, উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণ বলে কিছু থাকবে না, শুধুমাত্র কর্মের ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যাবে, যাদের কর্ম যত বেশি ভালো হবে তারাই তত বেশি আল্লাহর নিকট সম্মান লাভ করবে।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা জাতিগত পরিচয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিন্তু এটাও স্পষ্ট করেছেন যে সেই পরিচয় শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতার মানদণ্ড নয়। কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে ইসলাম যথেষ্ট সম্মান জানিয়েছে। বুখারী শরীফের ৯২৩ নম্বর হাদিসে এসেছে:

> আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত: “আমার কাছে দুইজন আনসারী মেয়ে আঞ্চলিক গীত গাইছিল যার মধ্যে “বুয়াস” যুদ্ধের বর্ণনা ছিল এবং ওই দুইজন মেয়ে পেশাদার গায়িকা ছিল না। ঠিক সেই সময় হযরত আবু বাকর (রা) প্রবেশ

করলেন এবং এই দেখে তিনি বললেন যে: "ঈদের দিনে নবীর বাড়িতে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র আর শয়তানি কাজ হচ্ছে! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন: হে আবু বকর, প্রত্যেকটা জাতির উৎসব থাকে আর এটা আমাদের জাতীয় উৎসব"।

আরেকটি হাদিসের মধ্যে এসেছে:

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত: "তিনি এক আনসারী ব্যক্তির সাথে তার এক আত্মীয়ের বিবাহ সম্পন্ন করছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন: হে আয়েশা আনন্দ ফুর্তি করার জন্য তোমাদের গায়িকা কোথায়? আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো বিয়ের সময় আনন্দ-ফূর্তি এবং গীত পছন্দ করে" (বুখারী শরীফ, কিতাবুন নিকাহ)

উক্ত হাদীস গুলি থেকে প্রমাণিত যে নবী (সা:) আঞ্চলিক সংস্কৃতিক এবং রীতি-রেওয়াজকে পালন করার অনুমতি দিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রীতি ইসলামের মূল নীতির বিরোধিতা করেনা। নবী (সা:) খোদ নিজেই গর্বের সহিত নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে:

"আমি মিথ্যুক নবী নই এবং আমি মোত্তালিব (বীর যোদ্ধা) বংশের সন্তান" (সহীহুল বুখারী: ২৯৩০)।

নবী (সা.) বলেছেন: "নেতৃত্বের অধিকারী কুরাইশ বংশের ব্যক্তিরাই হবে" (মুসনাদ আহমদ)।

বহু হাদিস এবং কোরআনের আয়াত রয়েছে যেখানে জাতিগত পরিচয় এবং সংস্কৃতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি নিজের নামের সামনে নিজ নিজ বংশের উপাধি যুক্ত করতেন। নবী (সা:) বিভিন্ন জায়গায় নিজের পরিচয় দিয়েছেন কোরাইশ এবং বানু হাশেমের উল্লেখ করে।

আমরা যদি ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা, বিবাহ, রীতিনীতি এবং জীবনযাত্রার যে নিয়ম কানুন রয়েছে সেগুলি লক্ষ করি তাহলে বুঝতে পারব যে বহু ক্ষেত্রে আরবদের পুরনো রীতিনীতিকে অক্ষত রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র যে সমস্ত রীতি রেওয়াজ ইসলামের মৌলিক নীতিবিরোধী ছিল সেগুলিকে বর্জন করা হয়েছে।

ইসলাম কোনদিনই কোনো জাতির সংস্কৃতি এবং পরিচয় মুছে ফেলতে বলেনি বরং সংস্কৃতির সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহিত করেছে। তবে জাতপাতের ভিত্তিতে যাতে কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্য না হয় সেই বিষয়ে ইসলাম খুবই গুরুত্ব দিয়েছে।

নিজ নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষত রেখে বৈচিত্রের মধ্যে একতা আনার চেষ্টা করতে হবে। একটা মানুষের একাধিক পরিচয় হতে পারে তার জাতীয় পরিচয়, ধর্মের পরিচয়, বর্ণের পরিচয়, ভাষাগত পরিচয়, পেশাগত পরিচয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কোনো পরিচয় পরস্পর বিরোধী নয়। পরিশেষে বলি যে একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই এগুলির সংরক্ষণ জরুরী। নিজ নিজ সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাসকে বাঁচানো প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং যদি তারা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই জাতির ভবিষ্যত অনিশ্চিৎ।

কবিতা: শেরশাবাদিয়া

শেরশাবাদিয়া প্রথম কবি আবদুস সামাদের তিনটি কবিতা

১. আধুনিক কবিতা

এ্যাক রোহিনের ভুজা ভাজিস
তোর কথা তাও বেজ্যায় খুবই।
মাছের পোনায় পোহিন কহিস
জাল বদোলে টানলি খালি হুঁচ্চা।।

এ্যাতো কথা কৈহলে পারে
কোহবি যে তুই কৈহছে।
নাতো কোহবি যে ফের কথার ফ্যারে
বিয়্যা গ্যাইট্যা ত্যাহলে কেনে দুইহ্ছে।।
(১ম প্রকাশ ১৯৮৯)

২. গীদের শৈলীতে

মোটা নুড়্হা, গোটা নুড়্হা, কুনবা নুড়্হা,
কুনবা মাগী ঢুঁড়ছিলো ঢুঁড়ছিলোরে কে।
তোর ব্যাটা পরচাঁট্টা, পাটের ভুঁয়ে ঢুঁকছিলো, ঢুঁকছিলোরে কে।।

মোটা নুড়্হা, গোটা নুড়্হা, কুনবা নুড়্হা,
কুনবা মাগী ঢুঁড়ছিলো, ঢুঁড়ছিলোরে কে।
তোর ব্যাটা পরচাঁট্টা, চামড়া চুরি করছিলো, করছিলো রে কে।।

মোটা নুড়্হা, গোটা নুড়্হা, কুনবা নুড়্হা, কুনবা মাগী ঢুঁড়ছিলো, ঢুঁড়ছিলোরে কে।
তোর ব্যাটা পরচাঁট্টা, বেজায় খুব ঝুঁকছিলো, ঝুঁকছিলো রে কে।।

মোটা নুড়্হা, গোটা নুড়্হা, কুনবা নুড়্হা, কুনবা মাগী ঢুঁড়ছিলো, ঢুঁড়ছিলোরে কে।
তোর ব্যাটা পরচাঁট্টা খালি চুঁকায় ভোরছিলো, ভোরছিলো রে কে।।

৩. নৃত্যনাট্যগীতি (কৌতুক/ডুয়েট)

শ্বাশড়ী: হাঁগে বহু, তোরঘে ঘরে কেবা করে ফুসুর ফুসুর?
বহু: আলগা কেহু লয়জী বিম্যা, আছে তোমার চ্যাঙড়া ফুকা শ্বশুর।
শ্বাশড়ী: হাঁগে বহু, তোরঘে ঘরে কেবা করে ফুসুর ফুসুর?
বহু: আলগা কেহু লয়জী বিম্যা, আছে তোমার দেওর-বেটির ভাসুর।
শ্বাশড়ী: আলগা কেহু লয়গে বহু, তো কেনে তোরা
দুঝন্যায় করিস ঘরের কোনায় ফুসুর ফুসুর?
বহু: ফুসুর ফুসুর করিনিজী বিম্যা, খালি জী-এর দুটা
আরমান মিট্যার ল্যাগ্যা করছি একটু ঘুসুর মুসুর!

হামি ভুঁই-এর ব্যাটা শেরশাবাদিয়া

ইবনে যায়নাব

১.

হাঁরঘে মায়ের শেরশাবাদিয়া কোখ,
হামরা হৈনু হাইল্যার ছাইল্যা
হাল-খাট্টা লোক

এখন অরা শহরিয়া মানুষ --
এই গাঁয়ের এক বাঁশথোপেরই
হোঁক...
শহরে যায়্যা ভুলছে গাঁইয়া কথা
'শুদ্ধ' বাঙলায় অরঘে নাকি ভোক

অরা নাকি সাধু ভাষার মানুষ
সংস্কৃত বাঙলা আরবী-উর্দু শিখ্যা।
হাঁরঘে মায়ের নামটা নাকি 'ধুস!'
শেরশাবাদিয়া চিহ্নারিট্যা 'ফিক্যা!'
অরা নাকি গড়ছে সংগঠন,
লিয়্যাছে অরা নাম বদলের ঠিক্যা!

২.

ছাই হৈয়্যা ভাইস্যা যাইতে
চাহি না ভিন দেশ, --
জনম-ভুঁই তুই মা গে,
নিজেরই মায়ার বলে
বুক চির‍্যা ফিরিয়্যা লিস
নিজের ছাইল্যাটাকে,
পিন্ধিয়্যা দিস তিন খাবোলে
মাটির কাফন-বেশ।

লতা পাতা ফুলের আঁচল দিয়্যা
ঢাকিস হামাকে,
পাখির ঠিকিন যত্নে রাখিস
নিজের বুকের তলে --
হামার পূর্বপুরুষ ঘুমায় মা গে
তোরই ছায়াঞ্চলে।

৩.

সুখে থাকতে ভুতে কিলায়
গায়ের দুধ তো মা-ই গিলায়।
নানা মায়ের নাম থুয়্যাছে
নামটা নাকি ভুল হৈয়্যাছে।
গোঁ ধৈর‍্যাছে বাচ্চারা সব
আধিয়্যা বাধিয়্যা দেখছে খোয়াব।
নাম খুঁইজ্যাছে মেলাইটি
চমকিলো মা-র পিলাইটি।
কাইন্দ্যা গুধা ভাঙলো হাঁড়ি:
চল না গে মা নানীর বাড়ি।

৪.

গাঁয়ের ইয়া শেরশাবাদিয়া
হাঁরঘে চোখের টিয়া
লোকে কৈহছে "পোঁটাপড়ি!
কে করবে গে বিহ্যা?"

কোলে পিঠে করনু মানুষ,
উঠলো বড় হৈয়া;
বদ নজরে তাকায় কে রে
নেশাতে মদ খাইয়া?

আইব্যারিটা কৈহছে, ছোঁড়া
বড্ড শহরিয়া;
কোহ্ছুনু, অর উঁচ্চা নাকে
হাঁচ্ছি পড়ুক ঘিয়্যা

ঐন্য গাঁয়ে সাজছে জাঁওই,
হিরোর মতন হিয়া --
কইন্যা হামার শেরশাবাদিয়া –
দুই নয়নের টিয়া

ফিরোজ আলি আবিরের দুটি গীতিকা

১. তাল দিঘী লাল ঘাঁটা

ওরে হাঁমার তাল দিঘী
ওরে হাঁমার লাল ঘাঁটা ...
থাকিস তুই তোরই মতন
অরা খেলুক জুয়ার-ভাটা ...

শিমুলের লাল পাইড়েতে
তুই যে হাঁমার নক্সা ক্যাঁথা ...
তোর বুকে সাধের শালুক
বড়ই ভালো সাধা-মাটা ...

বক্কন আঁইড়্যার হাম্বা ডাকে,
ছুইট্যা যাইস বাঁকে বাঁকে ...
বনফুলে সাজিসরে তুই
ট্যাইনা দিয়্যা প্রণয় ঘুমটা ...
ওরে হাঁমার তাল দিঘী
ওরে হাঁমার লাল ঘাঁটা ....

সোহাগী চাঁন্দের আলোয়
সোহাগ তুই বুঝিস ভালোই
ব্যাঁইচ্যা থাকুক নিতাই গোরার
সাধের প্রেম দোতারাটা ...

অরাই থাকুক সইভ্য বড়
ন্যাংটা স্যাইজা ন্যাংটা রাজা ...
হাঁমি বাঁচবো ভালোব্যাইসা
তোর ওই অসভ্যটা ...
ওরে হাঁমার তাল দিঘী
ওরে হাঁমার লাল ঘাঁটা ...

২. সুখেরও অসুখ

তোমার বাড়ি যাইবো বন্ধু
চিনিন্যা যে ঘাঁটা ...
আইল্যাপাথাড়ি টুঁইড়্যা বেড়াই
বুকের ঠিকানাটা ...

মোহনা আর মোড়ে মোড়ে
না-চিহ্না সব মুখ ...
বুকের ভিতির বাড়ছো তুমি
সুখেরও অসুখ ...
সেই অসুখে রাতের তারায়
লিখছি চিঠিটা ...
তোমার বাড়ি যাইবো বন্ধু
চিনিন্যা যে ঘাঁটা ...
আইল্যাপাথাড়ি টুঁইড়্যা বেড়্যাই
বুকের ঠিকানাটা ...

শকুন্তলার আঙ্‌ঠি ছিলো
ছিলো পরিচয় ...
তুমি হাঁমার, সব বুঝাবো
লুকিয়্যা ইশারায় ...
ফালি ফালি ধরবো মেইল্যা
বুকের ছবিটা ...
তোমার বাড়ি যাইবো বন্ধু
চিনিন্যা যে ঘাঁটা ...
আইল্যাপাথাড়ি টুঁইড়্যা বেড়ায়
বুকের ঠিকানাটা ..

অহেদুজ্জামান (রিন্টু)-এর দুটি কবিতা

১. মরদ সিন্ধু

ত্যাইলার ব-দ্বীপের ঠিকিন
হাতের পাঁচটা আঙ্গুল,
আলাধা আলাধা
আঙ্গুলের মৈধ্যে ঢুকলে
দরদরিয়্যা বৈহ্যাছিল সোত।

এক্‌খিব্যারে লদ্দীর ঠিকিন।
তাও মনে থুইসনি,
মরদ-সিন্ধুর পতন।

ভাবের কুকুর ঘরের মৈধ্যে পুষিন্যা
যার লাইগ্যা ডগর ডহারে
ঠোঙ্গা দিয়্যা আসি।
ভিড়ের ভিতির হারাইতে চাহিন্যা --
তাল্লাইগ্যা ডর আঁইকড়া থাকি।

রোজ কল্পনার ন্যাংটা পোথলা
বানাইতে বানাইতে•••
শরীলে তোর বাইড়্যা উঠে
আগুনের ভাপ!

ভাবছিস, দুর্বল সব মরদ
তোর আঙ্গুলের ফাঁকে?
বুঝনু, এগল্যা হাঁকে লয়,
তোকেই মজা দ্যায়!

২. আন্ধার রাইত

তারপর, মিটমিট্যা আলো।
আন্ধার রাইত।
এ্যাখনো ম্যালাই দেরি পঁহাত হৈতে।
আধখোলা হৈয়্যা শুয়্যা আছি।
কেহু নাই আঞ্জরে-পাঞ্জরে।

চুনকাম করা দ্যাওয়ালে খামোখায় ভাসে
পুরাণা এ্যাকটা উদাস ক্যালেণ্ডার।।
অতে দাগ দ্যাওয়া দিনগালা বারবার
হাতে পিন্‌হা চেন-ঘড়িটাও হামেসায়
যখন তখন সময়ে অসময়ে
আইল্যা-বাইল্যা কথা ভাবায়।

ঐ এ্যাকলা রাইতে চোখের পলকে
কত দৃশ্য লাছে।
কতগালা পুরাণা জিনিস বিছ্যানের নিচে
এখনো ভাঁজ কৈরা থুয়েছি।
তাহ্লে এমন কি হারিয়্যা দিয়্যাছি!

রোজঝি দেখি, জানলার বাইহরে
চোখ তুইল্যা...
গুইজর‍্যা যাওয়া ঝিঁঝিঁ-পুকার ঠিকিন
ব্যাকুল হৈয়্যা দূর থাইক্যা কার যেনে
কান্দার আওয়াজ ভাইস্যা আসে!
আর উদাস আশমানটা কিনা
কাতর শূন্যে ভাসে!
যেনে কত যুগ-যুগ সবুরের সুথে
এই এখন একলা নিশিথ্‌ রাইতে!

কুনু কুনু রাইতে স্বপন-কল্পনাতে
সহধর্মিনীর মতন
কেহু যেনে মনের অজানাতে
ওড়নীর সুগন্ধি হাওয়া ছুঁয়্যা দিয়্যা কহে --
"জানো, হামি তোমার লাইগ্যা
কত ব্যাকুল!"

চাতালের টবে সাজানো কুনু কুনু ফুল
নিন্দের হালাতে তুইল্যা লিয়্যা গেছি
অর কাছে।
তারপর, কত্তশত মনের কথা
কৈহতে কৈহতে
হঠাৎ কৈর‍্যা নিন্দ ভাঙ্গে
দুঃস্বপনের রাইতে!

মুহম্মদ সাজিরুদ্দিনের দুটি ইসলামী গীতি

১. তুল্যা ল্যাও করোনা বালা
(সুর: প্রচলিত)

তুমি, শুনো খোদাতায়ালা
তুল্যা ল্যাও করোনা বালা
রহম করো খোদাতায়ালা
মিটিয়্যা দ্যাও করোনা ঝামেলা

গুনাহ্ কোর‍্যাছি পাহাড় সমান,
তুমি মাপ করো সুব্হান
গুনাহ কোর‍্যাছি পাহাড় আকার,
তুমি যে গফুর গাফ্ফার
তুমি তো রহমতের দরিয়া,
হাঁর্ঘে পাঁপ দ্যাও ধুইয়্যা

য্যাতে পারিন্যা তোমার মোহজিদে,
হামি পড়ছি নমাজ বাড়ীতে
আইজ আঁইহড়্যা বালস ঘরে অরাও
বন্দী বাড়ির ভিতরে
বন্ধ রৈহ্যাছে স্কুল মাদ্রাসা,
খুল্যা দ্যাও বাদশার বাদশা
গরীবের দুক্ বুঝো তুমি,
তুমি তো অন্তর্যামী

২. নমাজ পড়ো রে (সুর: ভাওয়াইয়া)

ও মন নমাজ পড়ো রে
ও মন রোজা রাখো রে
পার পায়্যা লিব্যা তুমি
কঠিন রোজ হাসরে

মা-বাপ ভাই-বোহিন
আসবেনা কাজে
ঢাল হোয়্যা বাঁচিয়্যা লিবে
রোজা নমাজে;
জান্নাতে পৈঁহ্ছ্যা যাইব্যা
মনের খুশিতে

দুনিয়াতে ভুল্যা-যায়োনা
ফরজ যাকাত দিতে
ক-এক দিনের লাইগ্যা
তুমি আইসসো দুনিয়্যাতে
পারের কড়ি জমা কৈর‍্যা
থও নিজের হাতে;
নাস্তা হাত করো তুমি
ওসর সাদকা দিতে
নাস্তা হাত করো তুমি
দান খয়রাতে।

আবদুর রহমানের দুটি কবিতা

১. আইটে সহি (গীদ)

আইটে সহি খেলতে যাব
কদম বাগানে
তোর আর হামার সুক পিরিতি
গাহাবো গানে

কদম ফুলের মালা গ্যাঁইথ্যা
পিন্‌হাবো তোকে
পসিন কইরা সাজিয়া দিব,
জ্বলুগ্না লোকে
তোকে হামি লুকিয়ে থুবো
হামার পেরাণে
তোর আর হামার সুক পিরিতি
গাহাবো গানে

বিহ্যান ব্যালা ব্যাইস্যা আঁইখ্যা
খিলাবো তোকে
গুলগুলা আর আন্‌হাসা তুইল্যা
দিব তোর ভোকে
কোখনু যুতি ভুলিস হাঁকে
ভাসবো নয়নে
তোর আর হামার সুক পিরিতি
গাহাবো গানে

২. ন্যাঙটা কালের কথা

ম্যাঘের ফোটায় অ্যাইঝো টুঁড়ি
ন্যাঙটা কালের দিন
বিন্যা কামে পিছল্যা পড়্যা কাদায়
হোইতুং ঘিন।

মাছ মারতুং গামছা লিয়্যা
বেঙচি ভরা ছাঁক
দিরম হইলি লাঠি লিয়্যা
মা ছাড়তোক হাঁক।

পালিয়্যা য্যাতুং মাঝ লদ্দি
হেল্যা দুচোখ লাল
কপাল খারাপ থাকলে ওদিন
ভাঙতো পিঠে ডাল।

তালকুর খাওয়া হয়্যা গেলে
তাল চাক্কার গাড়ি
পানি পানি চালিয়্যা য্যাতুং
আসতুং না বাড়ি।

ঝমঝমিয়্যা ম্যাঘ অ্যাইলি
পেনটা দিদুং খুল্যা
ন্যাঙটা হয়্যা দোড় মারতুং
ম্যারের কথা ভুল্যা।

ঘ্যাকোর ঘ্যাকোর ব্যাঙ ডাকতোক
ভোন্নি সাঞ্জের বেলা
রাইত কাটতোক স্বপ্নে ভিজ্যা
উধাও বিহ্যান বেলা।

বান অ্যাইলে কিযে মজা
ক্যালার ভুঁড়ে চড়্‌হ্যা
আম বাগান আর লদ্দির কান্‌হা
আসতুং ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা

মাঝে মইধে পালিয়্যা য্যাতুং
আব্বার তহমন পিন্‌হ্যা
ওগল্যা দেখ্যা ছোট ছিটের
তহমন দিতোক কিন্যা।

এখোন বেলে বড়ো হেছি
ওগল্যা ছিলো যা তা!
ছ্যাঁচাই কোহছি অ্যাইঝো টুঁড়ি
ন্যাংটা কালের কথা।

মোহাঃ মোসারাফ হোসেনের দুটি কবিতা

১. তোর ঠোঁটের তিলে (গান)

ওই ছুঁড়ি তোর ঠোঁটের তিলে
আঁইটক্যা গেছে চোখ
কুন্ঠে হামার কাম কাজ
কুন্ঠে হামার ভোক (২)

তোর ডাগর চোখে সাত সমুন্দর
ডাগর বুকে ঝড়
যৈবনে তোর সুবুজ ফসল
কোরিসন্যা আর পর (২)

দুধে ন্যাংড়া আমের ফালি
গায়ের বরণ তোর
ধলো পিঠে গোচ্ছা চুল,
খাটেনা হাঁর জোর (২)
তুই হাঁর জীবনের তিষ্‌সার পানি,
জীবন বালুচর (২)

লৈ করা ওই পাঁচটা লোঘে
মানায় মেহেন্দি রং
তাকাইস যখুন ছ্যারাক ব্যারাক
লয়া লয়া ঢং (২)
তোকে লিয়্যাই জীবন লায়ে
একখান ছোট্ট ঘর (২)

বাঁশতলাতে ডুবলো চিক্যাস
খাটলায় চান্দনি রাইত
লাল টিকলি লাল কাপড়ে
হৈক মিলনের সাইত (২)
তোর হাসিতেই ভাঙ্গা ঘরে
ছড়ায় অহংকার (২)

২. হাঁর ভাষা, মার ভাষা

ছাইড়্যাছিনু যা অজ্ঞানে,
ধরবো এইব্যার সজ্ঞানে

মার ভাষা কহিতে যায়,
কেহু বেলে লোইজ্জা পায়

খ্যাপা তোকে নিন্দা দি,
নিজের ভাষায় শরম কি?

লাহারি ছাইড়্যা ব্রেকফাষ্ট খালি,
মুনে কি তুই শান্তি পালি?

পোহাত হৈছে মুর্গার বাঁকে,
"উঠ হে !" কৈহা উঠায় হাঁকে

রকসংগীত দিনু ছাইড়্যা
ভাটিয়ালী গলা ফাইড়্যা

কৈহ্যাও শান্তি মনের দুক,
মার ভাষায় দুনিয়্যার সুক

পানি

নুরুল হাসান

চোপোর রাইত পানি বর্ষিচ্ছে
প্যাটমোটা লদ্দী ম্যালাই বোড়ো
হাঁ কইরা
আগিয়্যা আসছে বাড়ীর মুনে-
তিলিকে গিল্যা লিবে লাগছে।

খ্যাড়ের চাল, টাটিতে – আর জান নাই
খুঁটিগালা লড়বড় করছে
কোখ্‌নি যে ভুইসরা পড়বে - ঠিক নাই।

চাল ব্যাহ্যা টিপির টিপির
ম্যাঘের ফোঁটায়
বিছ্যানা বালিশ তোষক সব
ধুইয়্যা গেছে।
খাটলার পাশিতে বইস্যা
মক্ষরের কামড় খাছি ...
তিরস্যা লাইগ্যাছে –
কলসিখানটা খালি
পানির কল – ওইট্যাতো ম্যালাই দূরে।

ম্যাঘের আওয়াজ আর চিলিকের আলায়
দিল-কইলজ্যা শুখিয়্যা চোখ দিয়্যা
বর্ষিছে আরাক পানি ... নুনছ্যা পানি।

হায় রে পানি - কত রুকুমের যে
তোর কারকিত।।

মানুষের প্রশ্ন

মো. আতাউর রাহমান

মরছে জওয়ান সীমান্তে আর
মরছে চাষা জমিতেই
ঘাঁটায় খতম পাইট-লেবার,
"দেশ নেতার শক্তিতেই?"
মানুষ সত্যি সওয়াল করে
"মানুষ তাহ্লে দ্যাশে নেই?"

হামি শেরশাবাদিয়া

আব্দুল হালিম

মাটির ঘরে মায়ের ঠিকিন
শেরশাবাদিয়া ভাষা,
না বুইঝ্যা কৈহছো কেন্যা
"আধিয়া বুদ্ধি চাষা!"

গরম দেখাই ঘরের লিয়্যা
করিন্যা পরের নকল,
খুইল্যা কহি আপন কথা
পাইনাখো যে ধকল।

চর্যাপদের ভাষার ওয়ারেশ
শেরশাবাদের ভাষা
যত্‌তুই করো নিন্দ্যা তুমি
হামার বুলি খাসা

মনের কথা কহবো মেলাই
লেখবো খাতায় খাতায়,
ভাষা দিয়্যাই চিহ্নারি থুইবো
ইতিহাসের পাত্যায়।

দ্বীন ও দুনিয়া

নুর আহমেদ

দুনিয়ার লালসায় লাল হৈয়্যা
সব হুঁস আইজ খায়্যাছি ধুয়্যা,
দিনে শুতি স্বপন-ঘোড়ায় চৈড়্হ্যা
ঈমানের ভিত গেছে লইড়্যা
বাইড়্হ্যা গেছে বেদাতের বোঝা
দ্বীনের সোজা ঘাঁটা হয় না খোঁজা।

লদ্দির বুকে লেখা এলেজি

মহম্মদ আলামিন

মাঝি লদ্দির বুক চিরে
নাকি লদ্দি মাঝির বুক চিরে --
ইড্যার উত্তর কে দিবে বাবু?

লদ্দি যে কহিল্যে মুনের সুখে
হামি নাকি হাল বাহি অর বুকে।

ছি ছি লদ্দি, পারলি এইড্যা কহিতে!!
তয় হামি কেন্যে পারব না সহিত্যে।

জনম গেল মুনের ভোখে
সেই কিসসা শুনাই তোকে,
না কহা সেই শোক সেঁপ্যা যাই
রোজঝি হামি তোরই বুকে ।

ওপারে হামার মায়ের বাড়ি
এ-কূলে পানু মরদের ঠাঁই
কাঁটাতারের এলেজিখ্যান
সই ভাব্যা তো তোকেই শুনাই।

ওপারে প্রেম তুলির আঁচড়
আঁক কাটে যখন হামার লরম বুকে,
বিলি কাটে দেউলিয়া মুন
তোরই বুকে তোরই সুখে।

ঈদ মোবারক

অমিত সরকার

চান্দ উঠ্যাছে, খুশির ফুল ফুট্যাছে,
সভার ঘরে আতর-খোশবু,
আইজ ঈদ আইস্যাছে

পর্তেক পেরাণে ঝৈর‍্যা পড়ুক
ঈদের আনন্দ,
এক হয়্যা যাই সভাই ভুইল্যা
হিংসা বিবাদ দ্বন্দ্ব

জাতপাত লয়, ভাই বহিন সভ,
মানবতার জয় হোক,
ধর্ম যে যার উৎসব সভার –
শুভ ঈদ মোবারক

পালিয়্যাই গেনু

ইমানুল হক চৌধুরী

পালিয়্যাই গেনু,
হ্যাঁ ছ্যাচ্চাই!

কুনুদিন আসবো তাও ভাইব্যাছি নাকি!
ঝুঁঝকি থ্যাকতেই যখুন
ধান কাইটতে ভুঁয়ে য্যাছিনু,
তুইও তখুন বদনা লিয়্যা.....

ওই আন্ধারেই বুঝিন শ্যাষবার
তোর পানপারা হাসি মুখখান দেখনু.....

অ্যারপর ভুঁয়ে ভুঁয়ে ধান কাইট্যাছি
আর কাইট্যাছি মুন;

কিন্তো তোর হাসিখ্যান....... ভুলিনি....
হুর হয়্যা ওই হাসি হামাকে তাড়াইলছে
মাঠ থ্যাক্যা মাঠে, তেপান্তরে।

পাল্যাতে পাল্যাতে কখুন যে ফর্সা হইল!
আর তুইও দুব্যাটার হাত ধৈর‍্যা
ওই হাসি মুখে ক'হলি:
"ক্যামুন আছ জি ভাই!"

সেই যে পালাইনু ---
পাছা ঘাঁটায় আর তাকিয়্যাই দেখিনি।

হাঁর বাংলা

জাহাঙ্গীর আলাম

হাঁর বাংলা পাঠ্ঠা যুবক
কোলকাত্তা শহরে,
হাঁর বাংলা ভোগ বিলাসী
কল্যাণীর আদরে।

ঐখ্যান থেক্যা এক পাঁ দু পাঁ
বর্ধমানেই শেষ,
হামরা হনু সতারবেটা-
উত্তর বাংলা দেশ।

এমনি ফেরিওয়ালা

রাজীব সরকার

হাল বাহাতে কিননু অ্যাঁড়্যা
বোহুর গহনা বেচ্যা,
ম্যাগ ল্যাগ্যাছে ভুঁইয়ের কানটায়
সিন্যার বহর খিঁচ্যা।
ম্যাগের চিলিক গুড়ম গুড়ুম
কুণ্ঠে চৈল্যা গ্যালো,
পুয়ল-কাঁড়ি খাইলো অ্যাঁড়্যা,
ভুষাও শ্যাষ হৈলো।

বেটি ক্যানছে বোহু ক্যানছে:
গহনা লিয়্যা দে,
অ্যাঁড়্যা লিয়্যা চলনু হামি
গহনা লিয়্যানতে।
অচিনতলার হাট গেনু,
কহে না কেহুই দাম,
কপাল ভিজ্যা সিন্যা ভিজ্যা
ডুবায় হাঁকে ঘাম।

পানির দরে অ্যাঁড়্যা দিনু
কৈলজ্যা ছিঁড়্যা গ্যালো,
গহনা লিয়্যা ফিরনু ঘরে
বোহু হাইস্যা আইলো।

সাঞ্ঝ রাইতে কালাইর উটি!
বাগুন পুড়িয়্যা সানা!
মিনস্যাকে উ কৈহছে, মরদ,
কম হৈল চাইল দানা,
পরের হাটে ফের য্যাব্যা জী,
রাম-ছাগল হাঁর লিয়্যা,
সওদাপাতি লিয়্যা আইসো
বকরীর টাকা দিয়্যা।

চলনু হামি বকরা লিয়্যা
হাটে থ্যাক্যা হাটে,
এমনি হামি ফেরিওয়ালা
সংসার-হাটে-ঘাটে।

মন্দির-মাসজিদ ভাঙা-গড়া

তাসবিরা খাতুন

মসজিদ মন্দির গির্জা ভাঙ্গিস
নরপিশাচের দল,
ক্ষমতায় থাইক্যা প্রয়োগ করিস
নিজের শক্তি বল

ক্ষমতা অ্যাকদিন হইবে শেষ
দুর্বল হৈবি তোরা,
থাকবিনা রে সারাজীবন
জুয়ান তাজা ঘোড়া

পাপের বোঝা ভারি হৈলে
হৈবি রে ছারখার,
লুকিয়্যা কুণ্ঠি ছাড় পাবিন্যা
জুয়ারি বাটপাড়

ক্ষমতার জোরে কিনতে পারিস
পার্লামেণ্ট আর কোর্ট,
ভিতর ভিতর দেখভি হাঁরা
হৈব রে একজোট

যাদের উপাসনার মহল ভাইঙ্যা
গড়িস আপন,
পরের বুকে দুঃখ দিলে
ছাই হৈবে তোর জীবন

"সব কিচ্ছুরই পতন আছে"
ঐশীবাণী মূল,
তোরঘে ও পতন হৈবে
না শুধরাইলে ভুল

যেদিন ভাঙিস পবিত্র ঘর
সেদিন কালো দিন,
ঘুচবে আন্ধার আসবে আলো
ফিরেবই তো সুদিন

যুগের হাওয়া

নাসরিন আলম

গাঁয়ে হারঘে কারেন ছিলনা,
আন্ধারে থাইকতোক ঘর দুয়ার
গরু বাছুর লাইগলে মাঠে
চাষা ধৈরা দিতোক খুয়ার।

লদ্দীতে মেলায় পানি ছিল,
মাছ ধৈরতোক জ্যায়লার দল
লদ্দীর কান্ধায় বালুর চরে
খেলতোক সবভায় লিয়া বল।

পাইট মুনিষ মাঠে যাইতোক
পোঁহাতে উইঠ্যা লাহাড়ি লিয়া
পাটের জমি লিরান দিতোক
বড় বড় দাউলি দিয়া।

ছাইলা পিলারা ইসকুলে যাইতোক
বাসের গেটে ঝুইল্যা ঝুইল্যা
সাঞ্ঝের ব্যালা চেরাগ জ্বাইল্যা
পড়হিতে বৈসতোক বই খুইল্যা।

সবই এখন বৈদল্যা গেলছে,
বালির চড়া লদ্দীর মাঝে
গরু এখন হাল বাহেনা,
টেরাকটার সভায় লাগায় কাজে।

ছ্যায়ল্যা পিলারা বল খ্যালেনা,
মোবাইল লিয়া ফেসবুক ঘাঁটে
ইউটিউবে সব ভিডিও দ্যাখে,
পড়হাশুনা উইঠছে লাটে।

দিনে রাইতে ইউটিউব খুইল্যা
বহু বেটিরা রান্ধন শিখে
মা খালারা টিভি খুইল্যা
সিরিয়ালে সব লাছন দ্যাখে।

যুগের তালে পা দিয়াছে,
এইট্যা নাকি কলির কাল
আইসছে আরো কঠিন সমায়,
জুয়ানরা সভাই ধরো হাল।

বন্যা

ফাইসাল ইসলাম

হামি যখন ছুট্টু ছিনু
আসত যখন বান,
বান-পানিতে হেলতে গেলে
মা ধরতো কান

হাঁইস্স্যা লিয়া দোড়িয়া যাতুং
সাদ্দামেরঘে বাড়ি,
হামরা দুঝন ক্যালার বাগান
যাইতুং তাড়াতাড়ি

ক্যালার গাচ কাইট্যা কাইট্যা
বানায়তুংযে ভুঁড়,
ভুঁড়ে চৈড়হ্যা পানির উপর
যাইতুং ম্যাল্যায় দুর

মজা লাগতোক যাইতে তখন
জ্যাগতো দূরে কাইশ্যা
ভুঁড় থ্যাক্যা কুদ্দ্যা পড়তুং
উল্ট্যা যাইতুং ভাইস্যা

দুপ্পহারে ভোক লাগতোক
জ্বলতোক খুবই প্যাট,
ভক্কেরা ভাত খায়্যা দায়্যা
বিছ্যানে হৈতুং ল্যাট

ম্যাঘ উইড়্যা যা

অবাইদুর রহমান

ও ম্যাঘ, ম্যাঘ তুই যা না উইড়্যা
হাঁরঘে খাল, ডোভা, লদ্দী গেছে ভৈর্‌যা
ডহার-ট্যাহার গেছে খারাপ হইয়্যা
ও ম্যাঘ, ম্যাঘ তুই যা না উইড়্যা

পৈখোরে ছাইড়্যাছিনু বাটা, রুহির মাছ,
হাঁর বাপ ম্যাঘের আগে
কহ্যাছিল পৈখোরটা ছ্যাঁচ
তার পরের দিন ম্যাঘ হৈয়্যা
গেলো পৈখোরটা ভৈর্‌যা
ও ম্যাঘ, ম্যাঘ তুই যা না উইড়্যা

ভাইব্যাছিনু ভাঠিব্যালা যাবো চা খাইতে,
দেখতে দেখতে কখন যে
চইল্যা গেছি নিন পারতে
নিন ভ্যাঙ্গ্যাছে যখন উইঠ্যাছি
ধড়ফড় কৈর্‌যা,
ও ম্যাঘ, ম্যাঘ তুই যা না উইড়্যা

চোখ কচলাইতে কচলাইতে
গেনু মুখ ধূইতে,
পিছ্‌ল্যা পৈড়্যা যায়্যা
তহমন খারাপ হইয়্যা গ্যালো ডেড়িতে,
ফের গা-হাত ধুইতে হৈবে
কত কস্ট কৈর্‌যা
ও ম্যাঘ, ম্যাঘ তুই যা না উইড়্যা

গাঁয়ের চাষি

নিয়ামত তুল্লা

লাভের আশায় ধার লিয়া চাষি
চাষ করে ধান,
খরচাপাতির থাইক্যা কেন্যা বেশি
বেচার সময় কমে ধানের দাম?

দাম আঠারোশো টাকা, তাল্লাইগ্যা ফের
কষ্টেমস্টে চাষ করে জঞ্জোরা,
বেচার সময় আঠারোশোর
আধেক হৈলো দাম,
এট্যা দেখ্যা চাষি হারায় জ্ঞান

গাঁয়ের বুড়া লোকগালা তখন কহে:
তোরা ভোট দিয়্যা খাড়ো
কৈর্‌যাছিৎ সরকার,
কম কৈর্‌যাই তোরঘে কথা
শুনা দরকার

চাষি জুটাই দ্যাশের প্যাটের আহার,
অকে সরকার করেনা সন্মান,
বাংলা-ভারত! জাগরে,
ওরে, জাগরে চাষি মহান!

অসুখ

এম. এন. রাজ

অরঘে গাঁয়ের মোল্লের ব্যাটা
বাহাদুর মদের নেশায়
মোড়লটা ফের খুব ঈমানদার
চতুর চাল্লাক বেজাই

পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে
একটু দ্যাই না ফাঁকি...
এমন কুনু এবাদত নাই
করতে যেট্যা বাকি...

ব্যাটা বেটির বিহা দিবে
সাইফি হানফি দেইখ্যা...
একটাও ভাষণ প্যাইবানাখো
মাযহাবকে বাদ রাইখ্যা...

গোট্টা গাঁয়ের বিচার করবে
ব্যাটাকে বাদ দিয়া...
সাইফির সাথে হানফির বিহ্যায়
খাইবেনাখো বিহ্যা...

সমাজ হামার, এন্নি কারবার
ভাইব্যা পাইনা হামি,
সমাজ যখন হানফি সাইফি
মানুষের হয় কমি...
গরীব দুখী সাধারণের
দ্যায় না যারা ছাড়
বাইছ্যা বাইছ্যা অরঘে আগে
চাহছি হামি বিচার...

পঁহাত হৈলেই

মুহাম্মদ ইসমাইল

রোজ পঁহাত হৈলেই
বুকের ভিতিরট্যা চমক্যা য্যায়
হা কৈর‍্যা আসমানে চায়্হ্যা রহি
চোক হ'নে পানি গৈড়্যা পরে

অবুজ মনকে বুঝাইতে না পারি:
"বুড়া না হৈয়্যাই চৈল্যা গেল্যা,
হামার যৈবন কেন্নি কৈর‍্যা মানে,
একলা একলা পৈড়্যা রহি
পিরিৎ জমায় ম্যাঘের সোথে"

চিকাশ উঠে রোজ পঁহাতে
আলো দিয়্যা হাসায় সভার ঘর,
হামার বাস ঐ আন্ধার ম্যাঘে
চিকাশও হামার দুক বাড়ায়

কেমনি কইর‍্যা থুই

প্রকাশ মণ্ডল

কুণ্ঠে গেলি ময়নার আব্বা
হামরাকে তুঁই ছ্যাইড়া,
দুইটা গাদ্দা ছ্যাইলা মানুষ
করবো কেম্যান কইর‍্যা।

ছম্মাস থ্যাইকা বিড়ি বন্ধ
ন্যাইখো কোনো কাম,
ছ্যাইলা দুটা পেটের জ্বালায়
লিছে যে তোর নাম।

কাপড়-ধড়ি পুরনা হইল
ন্যাইখো হাতে টাকা,
আত্তা ব্যাড়কা পরব গেল
হাঁংরে র‍্যাইখা ফাঁকা।

ছ্যাইলা দুটার মুখখান দেইখা
বহইছে চোখে পানি,
এখন যুতি ব্যাঁইচা রহতিস
টানতিস যে তুঁই ঘানি।

যাত্তাবের তুঁই দিল্লি য্যাইতিস
আনতিস হামার শাড়ি,
ছ্যাইলা লিয়া কদিন হামি
য্যাইতুঁ বাপের বাড়ি।

রেশনের ভাত আলু শানা
কাত্তা খাবো কহ,
ছ্যাইলা-পুইলার শুক্‌খা মুখ
য্যাইছে কি আর সহা।

কাটমানিটা দিনু না সে
প্যাইনু নাখো ঘর,
ভাঙ্গা ঘরে পড়ছে পানি
হইছে যখন ঝড়।

র‍্যাইতে হামার নিন আসেনা
পড়ছে তোকে মনে,
হ্যাইসা-খ্যাইলা সুখে-দুখে
রহইতুরে তোর সনে।

একলা র‍্যাইখা গেলিরে তুঁই
লকডাউনেরই দিনে,
রোজ্জিরে তুঁই আসছিস কাছে
হামার ভ্যারনি নিনে।

কবিতা: সুজাপুরী

মুহাম্মাদ ওয়াহেদুজ জামানের কবিতা

১. আপনা ক্যাওড় ঠিক কর

তোঘ্রে খালি পন্ডিতি পন্ডিতি কথা;
কথা কহিস না মুক নাচাইস, কিচ্ছু
বুঝতেও পারি না।

তোরা বাড্ডা হ্যালা করতিক,
টিটকারি মারতিক
আইজকা দ্যাকযা
হাফফুলের মাঝলা ব্যাটা কামোন
আলিগড়ের সায়েন্সের পোরফেসার।

তোরা এক্খিটা ব্যাটাপুতকেও
শিক্খতি করতে পারলি না,
পারলি না কিনে কহবি,
চাহিসই নি তোরা

তোঘ্রে দাউড় তো মাহাজনের
উঠান ভৈরা,
চায়ের দোকানের চাটাইতে
যাত্তা গাফড়া:
কার বেটি ভাগলো,
কার বোহু ভাত খাইবে না...
এগলাই রইজকার জালসার
সিলেবাস
হিংসাতে জইলা পুইড়া ধুঁয়া হৈয়া গেলি,
আগুন আর হৈতে পারলি না

আগে মামু, আপনা ঘরের
ক্যাওড় ঠিক কর
তোরা চাংড়া পাংড়ার গিনে
ব্যাড়া দিস ঠিকই
কিন্তু কাচ্চা বাত্তির ব্যাড়াতে
কাঁটা মারতে ভুইলা যাইস।
এগিনেই আইজকাও ওরোকোম
কোমবুদ্ধাই রৈহা গেলি,
তাওয়ো তাড়পান কমলো না
এ্যাকজারাও।

ব্যাড়া বাত্তির ব্যাপারটা ঠিকঠাক
বুইঝা(হ)লো কৈহাই দ্যাখ,
হাফফুলঘেরে নাম আইজ
গোট্টা মুলুকে

২. তোঘ্রেই দুনিয়া

চাচ্চা, গোট্টা গাঁয়ে তোঘ্রেই নাম
উত্তুনা ছাইঞ্চা লিয়া কাত্তা ধুমধাম
তোঘ্রে আছে ম্যালেই মানুষ আর লাঠি
কে লিবে তোর সীমানার এক ইঞ্চি মাটি?

ভোট আইলেও না আইলেও
তোরা পোরধান
জোন্মোনেই জানিস তোরা
রাজনীতির যাদুগান
মোড়ল তোরা সোব বিচার সালিশে
শুইনাছি আমদা টাকা রাখিস
বালিশে

তোরাই মোহজিদের যৈগ্য
সেগরেটারি
ইমামের উপর করিস ডিক্রি জারি
তোরা শিক্ষা বুঝিস, বুঝিস অনুষ্ঠান
তোরা না রৈহলে গাঁয়ের কে দিবে
সোম্মান?

মো. মোনিরুল ইসলাম নাদিমের অনুদিত দুটি কবিতা

১. অটল বিহারী বাজপেয়ীর "ঘর করা বাস্তু কাইসা হো"

বাড়িখান যামোনই হোক
বাড়ির আক্ কোনাতে মন খুইলা হাঁসার গিনে
আকনা জাগা রাখিস্।

সূর্যটা যাত্তাই দূরে রোহুক
বাড়িতে ওরির ঢুকার গিনে আকনা ঘাঁটা রাখিস্।

রহ্যা রহ্যা ছাদে চড়বি
ম্যাঘের তারাগেলা অবশ্যই গোইনা দেখবি
পারলে আকনা হাত বাড়িয়া চাঁনটাকে
আপনা হাতে ছুইয়্যা দেখার চেষ্টা করিস্।

যতিবা মান্ষের সাথে আকনা মিশতে চাহিস্
বাড়ির আঁজর পাঁজরে পড়োশী করার ইচ্ছা রাখিস্।

ঝড়িপানিতে ভিজতে দিস্
চাংড়াপাংড়া গেলাকে লাফান ঝাপানও আকনা করতে দিস্
যতি পারিস্, ঝড়ির পানিতে চ্যাংড়াপিলার ভাসাহার গিনে
কাগজের নাউকা বানাইস্।

আকনা ফুরসুত পাইলে চিকনা আকাশে
একটা গুড্ডি উড়াইস্
আর আহাঁ কহিছুনু যে গুড্ডি কাটাকাটি করার গিনে
ডোরে মাঞ্জনও দিস্!

বাড়ির আগাদিকে আকটা গাছও লাগাইস্
গাছে উইড়া আইসা বইসা রহা
পাখিগেলার কাচভাজ্ শুনার আক্খিজারা নিশাও রাখিস্!

বাড়িখান যামোনই হোক বাড়ির আক্ কোনাতে
মন খুইলা হাঁসার গিনে আকনা জাগা রাখিস্।

যেটা ঘাঁটা দিয়াই যাইস্
মিঠ্ঠা হুল্লোড়ে আকনা বুঝিয়া দিস্ যে
তুই ঐ ঘাঁটা দিয়া যাইছিস্
বাঁইচা রহার সোবটি মোড় বাড্ডা মাজাদারি
সব রকমের মাজা লিতে শিখিস্।

ফূর্তি রোহিতে শিখ্ না হে এ্যার বাপ
আত্তা মনমরা রহিস্ কিনে হে তুই
সময় থাইমা রহিবেনা হে, শুইনা রাখ্
বয়সের আত্তা চিন্তা করিস্ কিনে হে তুই?

২. হাজী শাওকাত আলি আলভির একটি উর্দু কবিতা

সবকুচ্ছু আহে হাংরে দ্যাশে রোটি নাই তো কি?
পর্তিশুর্তি লেপ্টিয়ালে না হে নেংটি নাই তো কি?

আলেমঘেরে আইজ ছড়াছড়ি আর লীডার গোল্লি গোল্লি
অফিসারঘেরে যান্ হইছে ঝড়ি আর দপ্তোর গোল্লি গোল্লি।

আজুব্বা আজুব্বা কবি সোব সাহিত্যকার গোল্লি গোল্লি।
বাড়ি বাড়ি সোব সক্রেটিস আর সিকন্দর গোল্লি গোল্লি।

সবকুচ্ছু আহে হাংরে দ্যাশে রোটি নেই তো কি?
পর্তিশুর্তি লেপ্টিয়ালে না হে নেংটি নেই তো কি?

হাকিম সোব আমোন যে আইন ভাইঙ্ দায়
ঘুষ পাইলে জানিস্ তো খুনি আসামীও ছাইড় দায়।

আমোন পাহারা দায় হাজতেও মান্ষের চোখ উপড়িয়া লায়।
সার্জেন আমোন হাংরে দ্যাশে প্যাটে অস্ত্রশুদ্ধা ভুইলা যায়।

সবকুচ্ছু আহে হাংরে দ্যাশে, রোটি নেই তো কি?
পর্তিশুর্তি লেপ্টিয়ালে না হে, নেংটি নেই তো কি?

নিন্দা-খোর

আখতারি খাতুন

আইজ কালকার ছুঁড়ীগালার আত্তাই ফেসাং
পড়াশুনা য্যামন ত্যামন বেশি খ্যালি ঢাং।
চোখে কাজল আর ঠোট ভৈরা লিপিস্টি
হাই-হিল সেন্ডেল
হাঁটছে তো জান কী করছে শুটিং।

আকনা পসিন ছুড়ি গাল্যার খুব ঘিমান্ড
ছুড়ীর বাপ মাউ গ্যালারও খুব ঘিমান্ড।

হামার ব্যাটা বহু ধুড়ছি,
আইজ নে হে...
কাহু কোহোইছে পড়া কম
কাহু কোহোইছে চাকরিয়া জামাই লিবো
মিলাহা মুশকিল হে।

বেটি চাংড়াখে বেশি পড়িয়া কি দরকার
চুলাতে তো আচ ঠেলবে
বেটির বাপ মায়ের কথা শুইনা
লাগছে কি আম্রে বেটি গালা
উড়া জাহাজ চালাইবে।

বেটি চাংড়া ঘাটা পথে বাড়াইবে নিহড় হইয়া
দুনিয়া জান কী উল্টা হইয়ালো
সোব বাড়াইছে উটের মতন মুখ কইরা।

তোর বাহাড়া ভাত কেহু ছিনিয়া লিছে কি হে
তুই গড় সভারুরর বেটির নিন্দা করছিক
চায়ের দোকানে বইসা
ফাদার ফাদার করছিক কিনে হে।

য্যাই খিলাইছে পিনাইচে তার কুনু কথা নাই
টোলা পাড়ার চোখে নিন নাই ...

কবিতা: মানভুঁইয়া

সৈনিকের আত্মকথা

গৌতম রাজোয়ার

নাই ছিল হামার বাপের টাকা,
বি.এ. এম. এ পাশ করাবেক্।
ফ্যান জুটে ত নুন জুটে নাই,
তাদের কি-আর পড়হা হবেক্।

লম্বা হয়ে উঠলি বাড়হে;
মাধ্যমিকো উইৎরে গেলি।
দোড়, ঝাঁপ আর কসরত কৈরে,
ফোর্সে যাবো ভাবেই লিলি।

বেশ কয়েকটা লাইন ঘুইরে
শেষ তক্কঅ হঁয়েই গেলঅ।
ট্রেনিং প্রিয়োড শেষ করলাম,
সীমান্ত-তেই পোস্টিং হৈলঅ।

দেশের লাইগে লড়ছি বৈলে
গরব হামার যতটা হৈয়,
তার চাইতেও গরব বেশি
এখন হামরা গরীব ত লয়।

হাসি ফ্যুটেছে বাপ মাঞের,
এখন দুটা খাবার জুটে;
এই কথাটা ভাবলে হামার,
সত্যি বুকটা ফুইলে উঠে।

গরীবের ব্যাটা গুলি খাবেক,
নেতার ব্যাটা ফুল চড়হাবেক,
দেশ রক্ষায় গরীবের ব্যাটা
সংসারে জন্য শহীদ হবেক।

আদি কথা

অমৃত রাজোয়াড়

আপন ভাষা, আপন লেগাচার
বড়অই সুন্দর হামদের সংস্কৃতি,
বহিরাগতদের কবলে পইড়্যে
মুইছ্যে যায় নিজেদের পরিচিতি।

পাহাড় লদী পশু পাখি
বন জঙ্গলেই হামদের বাস,
শিকার কইরে ফলমূল খাঁইয়্যে
কাইট্যে যায় বারঅ মাস।

বাঘ বাঘুত গাঁ গরাম থান
রৈহন করম জিতা বাঁধনা,
ইগিলানই হামদের আপন ঠাকুর
আর আপন ধর্ম সারনা।

বাবুসাহেব আসে ফাগুন মাসে
ইমুড়া উমুড়া পলাশে লালে লাল,
দুপয়সা আর পেটের জ্বালায়
বনফায়ারে পুড়ে মা বহিনের সনমান।

নিজভূমেই পরাধীন হামরা
অবহেলিত নির্যাতিত,
আদিবাসীদের দুঃখী জীবনের
নাঞ যে কনহ অন্ত্য।

মনোজ ভোজের দুটি কবিতা

১. ভাতটো দিয়্যে যা

গিরামটোয় উলুকচুলুক
হা-ডু-ডু মাঠ
সক্যাল থিক্যা পাত্যা কুড়াই
শুকনা পুকুর ঘাট

দেইখ্যে ইস্যেছি হামি আর
বাপঠাকুদ্দার ভাই
স্বাধীন হইল্য দেশটো মোর
পিট্যে ভাত লাই।

মাদল বাজ্জাই মহুয়া ফল
মাত্তাল চতুর্দিক
কব্যে আইসবে ভাত বাবু
আল্যয় ঝিকমিক!

হট্‌ঠাৎ দিখ্যি দেশ এল্য
স্বাধীন হামার দেশ
খাল্যি থাল্যায় লাল অক্ত
ভাইগুল্য বউয়ের পেট।

পেট্যের ভিতর ছানাগুলান
অক্ত মাখ্যি হামি
দেশটো এল্য জমিন নিল্য
বন্দুকবাহিনী।

দেশ দেইখলম নূতন স্বদেশ
হামার ভারত মা
ইত্যদিনের ভুখ-হরতাল
কুথ্যায় ছিলি গা?
এল্যিই যদি বারুদ কেনে
ভাতটো দিয়্যে যা!

২. লদিটো নুনি খুঁইজতে গিন্‌ছ্যে

হে-ই-ই-ও নুনি-ই-ই-ই-এ

সারা দিন জুয়ান বেটিটোর জইন্য
কেইন্দে মরে

লদি খুঁইজতে গিন্‌ছ্যে নুনি
উয়ার নুনি লদি খুঁইজতে গিন্‌ছ্যে।

ইখানে ইকটো লদি ছিল্য
উই পাহাড়ে ইকটো ঝর্ণা ছিল্য
তিরতির করি বইত, কখুন্য লাচ দিখাইত
লাচতে লাচতে লদি হইয়েই
গিরাম দিয়ে বইয়ে যেইত্য

নুনি লদি খুঁইজতে গিন্‌ছ্যে
ইকদিন ঘন্য মেঘ ইল্য
উ মিঘ্যে জল ছিলক লাই
উ মিঘ্যের উপর ভর করি
কত্য দৈত্যিদানো রাক্ষস খোক্কোস ইল্য
লদিটো লিয়ে গিল্য
লদিটো লিয়ে গিল্য

ইখন ইখানে শুকনা মাটি
ভোঁস ভোঁস করে
চারপাকে হাহাক্কার
জল লাই জল লাই
শুধ্যু শালপাত্যা
লদি লাই ঝর্ণা লাই
সব শুকনা
ই সব নুনি জেইনেও
লদি খুঁইজতে গিন্‌ছ্যে

আরে হেইও নুনি চল্যে আয়
মুদের লদি হারাই গিন্‌ছ্যে...

কবিতা: চাঁই ভাষা

ও নানা

মোহন মণ্ডল

শুনাহো নানা!
হ্যাম্মা ক্যাঞ্চা ধান কাটাহি-
অ্যাখনিও সোনা র্র্যাং ন্যায় ধ্যারক্যাই
অ্যাউরিসে ত্যান্নি চাপ দেলেই
ভাঙি যাহ্যাই, র্র্যাস বাহার হুহ্যাই

হ্যাম্মার তো স্বপ্ন হ্যাল্যাই
জৈষ্ঠকে শেষম্যা সোনা র্র্যাং ধ্যারলে
প্যাক্কাল ধানকে সুবাস ছোড়া গেলে
ভাটিয়ালি গীত গাহাতে গাহাতে
ধান কাটি মারিকে গোলাম্যা ভ্যারাপ...

কিন্তু আজখিনা ধান কাটলা অ্যালি
হ্যাম্মার ব্যাহু দুয়ার ন্যায় ঝাড় দেলক্যাই
আঙনা ন্যায় লিপালক্যাই
গোব্যরকে গোহরা দেবা ছোড়কে
হ্যাম্মার স্যাঙ্গে অ্যাল্যাই
ধান কাটিকে সাঁঝ বেলা ভাত চ্যাপাত্যাই

ত্যাই তো জ্যানাহ্যা-
আম্ফান তুফান আকে স্যব ধান
ম্যাট্টিম্যা মিশা দেলক্যাই
নুনা জ্যলসে ঢুবা দেলক্যাই
দো দিনমেই স্যব ম্যজি য্যাত্যাই
ধান ন্যায় কাটলে খানা ন্যায় জুটত্যাই...

ক্যাঞ্চা ধান ঢিকিম্যা ভাঙিকে
ভাঙাল ফুটাল খুদ্দি চাউর পাব
হা চাউরকে সিদ্দ ভাত তোরাকেও খিলাপ
নানা ত্যাই জি ম্যত ঘিনাইহ্যান
নানা ত্যাই গোসা ম্যত ক্যারিহ্যান
নানা ত্যাই চোখ ম্যত পাকাইহ্যান...

চাঁই আর ক্যালাই

বিজয় কুমার সরকার

বাপু হো বাপু, ক্যালাই ন্যাই বুনবে?
ক্যালাইকে বিনা ক্যাইসিকে চ্যালবে?

ক্যাল্যাইকে রোটি কি অ্যাচ্ছা লাহারী!
নুন-ঝাল-ভার্তা দেকে খো পেট ভ্যারি।

তেক্যার প্যারে দু গিলাস পানি পি লে,
ভুক ন্যাই ল্যাগত্যাউ গোট্টা দিন গেলে।

ঢেঁকিম্যা ধান কুট্, আঁটা পিস জ্যান্তামা,
ভূঁইমা হ্যাল, কোদারি চ্যালা ক্যান্টামা।

বিনা থ্যাকানকে কাম ক্যারা পারবে,
পুরা শ্যাক্তি দেকে কাম পুরা ক্যারবে।

ক্যালাইকে দাল হো বাপু, কি আচ্ছা দাল!
গাড়া ক্যারিকে ঠিকসে দেলে নুন-ঝাল।

সুড়ৎ সুড়ৎ ক্যারি পেটম্যা জ্যাত্যাউ ভাত,
পেট ভ্যারিকে খ্যাইবে চাঁটি চাঁটিকে হাত।

ক্যালাইকে ব্যাড়ি হো বাপু, কি স্বাদ, স্বাদ!
আলু-ব্যাইগ্যানকে ঝোরম্যা, আর স্যাব বাদ।

ব্যাড়ি পুড়াকে পিষ্, দে তেল, ঝাল, নুন,
ভ্যারতা দেকেই ভাত খো, কি ওক্যার গুণ।

ক্যালাইকে বাপু হো হোহ্যাই আচ্ছা ঘুগনি,
ভুজা মিলাকে সুখসে খাহ্যাই দিদি ভ্যাইগ্নি।

দিদিকে বিহামা বাপু হো, ঠিকঠাক ঘ্যাড়ি
দেব্যা যে হোবে ক্যারত্যাউ সাগুনাকে ব্যাড়ি।

চাঁইকে বিহাম্যা বাপু হো, ক্যালাইকে দাল,
ন্যাই হোলে কি চ্যালত্যাউ? স্যাব গোলমাল।

ক্যালাই আর চাঁই হোল্যাই সুরুজ আর চান,
ক্যালাই বুনবে হো বাপু ন্যাই ক্যারিকে আন।

কবিতা: কামতাপুরী

গরিব বাপের কাল বেটি

রূপো বর্মন

কেয়দিন পর মুই মোর বাড়ির রাস্তা ধরি যাউ।
মোক দেইখ্যা নানান লোকে নানান কাথায় করে কাউ মাউ।।

যখন বাড়ির কাছত গেনু,
শাশুড়ি মাউক দেখবার পানু।
সঙ্গে সঙ্গে পাও ধরিয়ে প্রণাম করিনু।।

ঘরের লোকলা চক্ষু বড় বড় কইরা
মোরতি দেখিল।
শশুর বাবা কহিল,
বেটি তুই নাকি মইরে গিসি কুহিসল নিখিল।।

কতনা সহজ সরল মানুষ তুই।
খালি গাঁওয়ের লোক নাহে
তোক বিশ্বাস করিসনু মুই।।

কিন্তু তুই এনঙ করিল কিসের বাদে।
মুই কাল মোটা গরিবের বেটি তারবাদে।।

মোর বাপে পণ দিবার পারে নাই মোর বিহা ভাঙ্গিল সেই রাতত।
তুই দয়া করিল,
বাপে স্বপিল মোকে তোর হাতত।।

তুই বড়লোক একনা বাপের বেটা।
তিরিশ-চল্লিশ বিঘা ভুই
তার সাথত একজন নেতা।।

বিহার আগে কহিছিলু
লিখাপড়া শিখাবো মোকে।
গোটা কাথালায় ভুইলে গেলু
দাসী-বান্দী বেনালো তোর ঘরতে।।

টিভি আর খবরের কাগজ গিলার গল্প শুনাইসলো।
কাল মাইয়া হবার বাদে আত্মহত্যা,
বাপে পণ দিবার পারে নাই
তারবাদে গলাত ফাসি -- মেলায় খবর,
মোক ফর্সা করবার বাদে হিমানী,
সোনো, পাউডার আনি দিসলো।।

যেই মানুষট মোর কাছুত বসতে ঘৃণা করে।
তায় একদিন যাইবার চাহাল ,
ঘুরিবা মোক ধরে।।

শুনে ত মুই আনন্দে আত্মহারা হলুং।
মোর প্রাণনাথের সাথে ঘুরিবা যাইবার বাদে,
সাজিবার ধরলুং।।

নদীর ধারত ওই পাথর বাঁধা ধারত বসিনু।
সেই সময় কেনঙ কাথা শোনালেক মোক ।
প্রাণনাথ কহিল,
সারাজীবন রাখিম মোর কাছুত তোক।
এনঙ করে মোর কারিয়া লিলে মন।
বুঝিবার পারু নাই মুই
খুন করিবার চাহাচে মোর বন্ধুধন।
আজি মুই সগারে মুখত শুনলুং
মুই নদীত ঝাপ দিসনু।।

আজি কা কি মনত পরচে তোর ওইল্যা কাথা।
মোক জঁড়ায়ে ধইরে আচঁকাতে দিসলো ধাক্কা।।
তুই ওইদিন গিসলো ভুইলা।
গরিবের বেটি মুই হেলবার শিখিচুং নদীনালা।।

হুস হারায় পইরে ছিনু নদীর পারত।
একটা গরিব মানসি লেগাইসলে ওর ঘরত।।

লোকট নেতা নাহে,
তারবাদে মানুষক মানুষ মনে করে।
পেটের ভাত জোগাবার বাদে
নদীর মাছ বিক্রি করে।।

মুই তোক দোষ দিবার আসুনং নাই।
থানা পুলিশ নেতা মন্ত্রী ডাকিবার বাদেও আসুনং নাই।
কারণ সগারে তমহার একখান চাটাইতে ঠাই।
তহমার রূপ আলেদা তাহ তমহরা ভাই ভাই।।

তোক মুই মোর দেবতা ভাবিসলুং।
তোর বাদে জীবনট উৎসর্গ করিসলুং।।

কিন্তু যেই মানুষট নারীর সম্মান করিবার জানেক নাই।
তায় দেবতা নাহে
পুরুষজাতির কলঙ্ক রুপে ধরাত পাইচে ঠাই।

শেরশাবাদিয়া প্রবন্ধ

সাদাত হোসেন মান্টো: হারিয়্যা যাওয়া এ্যকখান কোহিনুরের নাম

মিরাজ আজাদ

(শেরশাবাদিয়া রূপান্তর: এস. আহমেদ)

মান্টো সমোন্ধে লেখতে গেলে মনে পড়ে পিঠের-ডাঁড়ি-সোঝা ঋত্বিক ঘটকের নাম।ম্যাল্যাইঝোনা মান্টোকে ঋত্বিক ঘটকের সুঁতে তুলোনা কোর‍্যা থাকেন। অর লেখাগালা পোড়লে ফের কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের কথা মনে পৈড়্যা যায়। মাটি ঘুঁষা লেখা।

সাহাকোড় ওপরতালার বাবু-বাবুয়ানিকে লিয়্যা যখুন ম্যাল্লাই লেখক নাম-ডাক পায়্যাছেন, মান্টো তখুন ঐ ঘাঁটায় না হাঁইট্যা অর মনের খোরাক্ ঢুঁড়্যা পায়্যাছেন মদের ভাট্ঠিতে, বেশ্যাপাড়ায়, পানওয়ালা-দোকানদার, ধোবা, লাপিত, দালাল ও যেঠে-সেঠে কাজ-কাম করা লেবারের্ঘে মৈধ্যে। অরাই অর লেখার আসল বিষয় আর প্রেরণা।

জৈন্ম্যাছেন ১৯১২ সালের ৫ মে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে। তিনি আলিগড়ের ছাত্র ছিলেন আর খুব্বি আগিয়্যা-যাওয়া মেজাজের লোক ছিলেন।১৯৩৬ সালে হতে ১৯৪৮ সাল পৈর্যন্ত মুম্বাইতে ছিলেন। সিনামা-জগতের সুঁতে অর ঘুনিষ্টতা ছিলো, লেখক ছিলেন। জীবনে ছিলো বেহায়াপনার চিহ্নারি, হৈ-হুল্লোড়বাজ, মাতাল আর একলা জীবনের সঙ্গীহীনতা অকে টাইন্যা লিয়্যা যাইতোক পাপী-তাপী, মাতাল বেশ্যার্ঘে ঠেকে। চল্লিশের দশকে ভাগ না হওয়া গোটা ভারতের আইনে বেহায়াপনার লাইগ্যা মান্টোকে লাহোরের আদালত তলব কৈর‍্যাছিল।

মান্টোর ধ্রুপদী গল্প "টোবাটেক সিং" দেশ ভাগ হোয়্যা যাইব্যার বাদে পাগলা বিনিময়ের কাহানী। দেশ ফের ভাগ হয় ভালা? ১৫ বচ্ছর জেল খাটা এক শিখ ক্ষ্যাপা বিষেণ সিং জানতে চাহে, অর গাঁ টোবাটেক সিং ভারতে পোড়্যাছে না পাকিস্তানে। পাগলা বিনিময় চুক্তির লাইগ্যা পাকিস্তান থাইক্যা যখুন অকে ওয়াঘা বর্ডারে জোর কোর‍্যা ভারতে পাঠানো হৈছে, উ কুনুমতোনি যাইবেনা। গোটাই রাইত দু-দেশের কাঁটাতারের বেড়ার সীমানার মাঝখানটায় নো-ম্যান্স-ল্যান্ডে কাট হোয়্যা খাড়িয়্যা থাকে আর পঁহাত-ভোরে এ্যকবার চিল্লিয়্যা উইঠ্যা পৈড়্যা যায়।

"ঠান্ডা গোস্ত" কাহানীতে দেখি,দেশ ভাগের সমায় রায়টে মোসলমানের্ঘে লোহুতে হাত লাল করা শিখ জুয়ান মরদ ঈশ্বর সিং ঘরে ফিরৢা আইস্যা কুনুমতোনিই অর পেরেমিকার সুঁতে সহবাস করতে পারছেনা। পেরেমিকার সন্দেহ হয় যে অর মরদ নিশ্চয়ই ঐন্য কুন ঢেমনির সুঁতে সহবাস কোর‍্যা আইসসে। রাগে দুখে ঈশ্বরেরই কৃপাণ লিয়্যা অকে লোহু-লোহান কোর‍্যা দেয়। মরতে বসা ঈশ্বর স্বীকার করে, উ একটা মোসলমান বেটিচ্যাংড়াকে জোর কৈর‍্যা বলাৎকার কৈর‍্যাছিলো; কিন্তু, হাইল্যা হাইল্যা উ বুঝতে পারে আসলে ঐ বেটিছাইল্যাটা মরা। ঐ লাইগ্যাই কাহানীর নাম "ঠান্ডা গোস্ত"।

অর আরো এ্যকটা হাড় ঠান্ডা করা কাহানী "ঘুর‌্যা আসা" যেট্যাকে সামনে রাইখ্যা সানি দেওলের অভিনয়ে *গদর* ফিলিম হয়্যাছিল। এই কাহানীতে রাইটে বোহু-হারানো সিরাজুদ্দিন অর খুব্বি রুপস্বী বেটি সখিন্যাকে উদ্ধার কৈর‌্যা যখুন স্ট্রেচারে শুতিয়্যা হাঁসপাতালে লিয়্যা আসেন, সেরাজুদ্দিনও পাছে পাছে ঢুঁইক্যাছিল। ডাক্তার সিরাজুদ্দিনকে ঘরে আলো আইসব্যার গোনে জালনা খুলতে কহেন, "খুল্যা দ্যাও"। আধ-মরা সখিন্যা সুঁতে সুঁতে অর পিন্ধোনের সালুয়ারের ফিত্যা খুইল্যা নামিয়্যা দিয়্যা দু-পা ফাঁক কৈর‌্যা দেয়। আসোলে অকে এতবার বেধর্মী হেন্দু আর নিজ ধর্মের মোসলমান পুরুষ বলাৎকার কর‌্যাছে যে "খুইল্যা দ্যাও" উচ্চারণের সুঁতে সুঁতে অভ্যাস হোয়্যা যাওয়ার ঠিকিন অর হাত সালুয়ারের ফিত্যাতে চৈল্যা যায়।

মান্টো এরকম ম্যালাই কৈলজ্যা ফাটা কাহানীর এক্‌খিবারে মানানসহি রূপকার। অকে উপমহাদেশের রায়ট ও দেশভাগের সবচ্যাহ্যা ভাল কথাকার কোহিলে একটুকাও ভুল হৈবেনা। দেশভাগের বেদনা, ভিঠ্যা-মাটি-হারা মানুষের হাহাকার, রায়টের আতং ও ভয়াল ডর লাগা ছবি, ধরম লিয়্যা হিংস্যা – এতো সুন্দরভাবে লেখতে পারে এমন কেই বা আর আছেন?

ঘিনাহা দেশভাগের বেদ্‌নাতে মান্টো লেখলেন: "দেশভাগ আর অরবাদের নিঠুর বদ বদলাও হামার মনে এক বিদ্রোহের উনুভূতি থুয়্যা গেল"। অর মন যা থির করতে পারলেনা সেট্যা হৈল:

"হামরা কুন্‌ দেশের মানুষ এখন?
এ লোহু কারঘে যেট্যা বেরহমির
সুঁতে ঝরাইছে পর্ত্যেক দিন?...
আর ধরমের মগজ হোনে ছিঁড়্যা
ফেলা মড়ার হাড্ডিগালা!...
ঐগল্যাকে কি পুড়িয়্যা দেওয়া হৈছে? না কি কবর দেওয়া হৈছে?...
হামি যখুন লেখতে বসি হামার ভাবনা-চিন্তাগালা টুকরা টুকরা হোয়্যা যায়!
হামি চিন্তা করি মেলাই, কিন্তু ভারত হোনে পাকিস্তানকে, পাকিস্তান হোনে ভারতকে কিছুতিই আলাধা করতে পারিনা।
হাঁমি নিজে নিজকে বারে বারে পুচ্‌ করি,
কী হৈবে ঐসব লেখাগালা যা ভাগ না হওয়া ভারতে লেখা হোয়্যাছে?
ঐগল্যা কি দু-ভাগ হৈবে?
যখুন হামরা স্বাধীন ছিনুনা, স্বাধীনতার স্বপন দেক্‌তুং। এখন যখুন স্বাধীনতা আইলো, তখুন কেমনি কৈর‌্যা অনুভব করব ঐ পুরানা গোটা দেশ্‌টাকে?
ভারত স্বাধীন হৈল, জনমের সময় হোনেই স্বাধীন হৈলো পাকিস্তান। কিন্তো দু-টা দেশেই চরমভাবে বাহাল থাকলো মানুষের গোলামী, কুসংস্কার, ধরম লিয়্যা বাড়াবাড়ি আর বর্বরতা!"

ভাইগ্যের দোষ, মান্টোর বেশিরভাগ সৃষ্টিই উর্দুতে। হাইস্যকর ধরম-নিরপেক্ষ ভারতে পাকিস্তানের এই জাতীয় ভাষার চর্চাকে উৎসাহ দেওয়া হয়নি! ঐলাইগ্যা ইংরেজী তর্জমায় ইংরেজী সাহিত্য পাঠকের সংকীর্ণ চৌহদ্দীর বাহিরে মান্টো সেইভাবে চর্চা পাইলেন না। আইজও যখুন বাংলাদেশ-পাকিস্তানে হেন্দু সংখ্যালঘুদের ওপরে জুলুম

হয়, বিহ্যার নামে হেন্দু নারীর জোরপূর্বক ধরম বদল হয়; ভারতে যখুন জয়শ্রীরাম কহিতে অস্বীকার করার লাইগ্যা মোসলমানের ধড়-মাথা আলাদা হয়, গোরু-বাঁচাইব্যার নাম কৈর‍্যা যখুন তখুন মানুষ খুন হয় – ঠিক তখনই পোঁকা-কাটা স্বাধীনতার টুটা-ফুটা উপমহাদেশে মান্টোকে খুব্বি মুনে পড়ে। ভাইগ্যের দোষ দেশভাগের বিষ-বাষ্প ভারতকেও গিল্যা লিয়্যাছে! ভারতের ধরম-নিরপেক্ষতার সংবিধানের আড়ালে মারাত্মকভাবে ক্ষমতাশালী হোয়্যাছে হেন্দু-মোসলমানের বিভেদ। মোসলমানেরাকে এক ঘরে কৈর‍্যা থুওয়া, কাজ-কাম না দেওয়া, ভাতে মারার গুঁহীর চক্রান্ত -- এগল্যা গিল্যা খায়্যাছিলো মান্টোকে।

১৯৪৮ সালে মুম্বাই ছাইড়্যা চৈল্যা গেলেন বুকভরা বেদনা লিয়্যা, ঐঠে য়ায়্যাও দ্বিজাতিতত্ত্ব লিয়্যা লেখলেন। লেখলেন এক মোসলমান জুয়ান মরদ হেন্দু নারীর পেরেম লিয়্যা কাহানী। বিহ্যা করার গোনে চাপ দিয়্যা হেন্দু বেটিছাইল্যাকে মোসলমান করতে চাহে, হেন্দু পেরেমিকাটি পাল্টা যখুন মোসলমান পেরেমিককে কহে হেন্দু হৈতে; মোসলমান জুয়ানটি অস্বীকার করে। পেরেম কাহানী শেষ হৈয়্যা যায় এঠিই।

ভাইগ্যের দোষ, জিন্দা থাকার সময় অর গুণের কদর কএকঝন মানুষ বাদে সমাজের বড়ো অংশ বুঝেনি, ভারতের ঠিকিন দেশ যখুন অকে বুঝতে পারলেনা, এমন গল্পকারকে পাকিস্তানের মতন দেশ কীভাবে হজম করবে ভালা? মরার ক-এক বচ্ছর আগে ১৯৫০ সালে মান্টো অর স্বভাবমতনি বিদ্রুপ কৈর‍্যা লেখলেন, "একদিন হয়তো পাকিস্তান সরকার হামার কবরে একটা মেডেলও পিন্ধিয়্যা দিবে। ঐট্যায় হৈবে হামার চরম অপমান।"

পাহাড়ের সমান দুঃখ-কষ্ট, মুনমরাভাব, হাহুতাস আর অভাব-অনটনকে সুঁতে লিয়্যা ব্যারাম ভোগ করতে করতে চরম অযতনে ও অবহেলায় এক বুক জ্বালা-যাতনা লিয়্যা ১৯৫৫ সালের ১৮ জানুয়ারী এই দুনিয়া হোনে বিদায় লিলেন।

কী আশ্চর্য! পাকিস্তানে জনমের ৬৫ বচ্ছর পূর্তিতে পাক সরকার ঠিক ঐটায় করলে, যেটা মরার আগে মান্টো অনুভব কৈর‍্যাছিলেন, সাদাত হোসেন মান্টোকে পাকিস্তান "নিশান-এ-ইমতিয়্যাজ"-এ ভূষিত কৈর‍্যাছে। পাকিস্তানের এই কীর্তি দেখ্যা নজরুল-সঙ্গীতের দুটা লাইন মনে পৈড়্যা গেল:

"জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা
মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল"।

মমতার কুরবানি

আবু সামী

কুনু কুনু লোক কহে, আসল্ কুরবানি হৈলো নিজের ভিতিরক্যার পশুত্বের কুরবানি; মানে হিংস্যা, ঘিন্যা, রাগ্, লালচ -- এগল্যার কুরবানি। হাঁর কেন্যে যেন্যে এ কথাটা ঠিক লাগছে না। হাঁরা যেগল্যা জানওয়ার কুরবানি করি -- ঐগল্যা সব নিরীহ-লাচার প্রাণী, অরঘে রাগ নাই, ঘিন্যা নাই, হিংস্যা নাই, লোভ নাই। এট্যা বিচার করলে বুঝা যায়, মানুষের থাইক্যা বেশি শান্তশিষ্ট পেরাণী এগল্যা। অর লাইগ্যা হাঁর কহনা কি যে, হাঁরা তো হিংস্র পেরাণীর কুরবানি দিন্যা। হাঁরা তো কুকুর, বিলাই, শিয়াল বা বাঘের কুরবানি দিন্যা। ঐ লাইগ্যা, হাঁরঘে ভিতিরক্যার খারাপ খাসলত উইপড়্যা ফেলাকে হাঁরা তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি কৈহতে পারি, কুরবানি কোহবোনা। আল্লাহ মানুষের নাফস বা আত্মার কির‍্যা খায়্যা কৈহছ্যেন:

> "ক্বাদ আফলাহা মান জাক্কাহা। অক্বাদ খাবা মান দাস্সাহা।" এ্যার মানে হৈল, "ঐ লোক সফল হৈবেই যে নিজের নাফস বা আত্মাকে পাক-সাফ করে। যে নাফস বা আত্মাকে কালিমালিপ্ত করে, উ ব্যার্থ হৈবে" (আল-কুরআন, সুরা: শামস আয়াত: ৯-১০)।

হাঁরা ত্যাহলে হামারঘে ভিতিরক্যার কুন জিনিষট্যা কুরবানি করি? এট্যা বুঝার গোনে হাঁরঘে মনে থুয়া দরকার যে, কুরবানি হৈল ইব্রাহিম (আ)-এর সুন্নাত। নাবী ইব্রাহিম (আ:) স্বপনের মাইধ্যমে নিজের ব্যাটা ইসমাইলকে কুরবানি করার ইসারা পাইয়্যাছিলেন। স্ত্রী হাজেরা আর ব্যাটা ইসমাইল নিজে থাইক্যা এই কুরবানীর লাইগ্যা রাজী ও তায়্যার হয়্যা গেলেন। ইব্রাহিম (আ.) ইসমাইলকে কুরবানি করতে যান। আল্লাহর পথে সেনেহ-মমতার এমন ত্যাগ বা কুরবানিতে আল্লাহ খুশি হৈয়্যা ইসমাইলের চিহ্ন-স্বরূপ একটা দুম্বা কুরবানি করতে কৈহলেন ইব্রাহিমকে। এট্যার মানে হৈল নিজের সব থাইক্যা বেশি ভালোবাসার জিনিষট্যাকে কুরবানি করতে হৈবে। হাঁরঘে সংসার আর পরিবারের মানুষেরঘে লাইগ্যা হাঁরঘে ভিতির যে অতিরিক্ত ময়া-মমতা আছে, ঐট্যাকে আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানি করতে হৈবে। যেনে হাঁরঘে ঘর, সংসার, জমি-জায়গা, বাড়ির পশু বা ব্যাটা-বেটির উপর হাঁরঘে অতিরিক্ত ময়া-মমতা সত্যের ঘাঁটায় চলার সময় বাধা না দ্যায়। আল্লাহ কহেন:

> মানুষের কাছে শোভাময় করা হয়্যাছে মাইয়্যালোক, ব্যাটাবেটি, জমা-রাখা সোনা ও রুপা, চিন্হারি-দেওয়া ঘোড়ারা, ঘরে-পোষা পশু, আর ফসলের খেত-খামার; এগল্যা এ দুনিয়ার ভোগের জিনিস, কিন্তু আল্লাহর কাছে রহ্যাছে সব চাইহ্তে বেশি আরামের মহল (আল-কুরআন, সুরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৪)।

কুরবানির গোস্ত গরীব-মিসকিন, পড়োশীগণ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব – সভাইকে খাইতে দিতে হয়, অর লাইগ্যা কুরবানির পশু পেরেমের প্রতীক, মমতার প্রতীক, মানুষের গোনে মানুষের ভালবাসার প্রতীক। আল্লাহ-তাআলা কহেন:

> তোমরা কোখনু পুরা নেকী পাইব্যানা, যুতি তোমরা নিজেরঘে পিরিয় জিনিস থাইক্যা কিছু খরচা না করো (আল-কুরআন, সুরা: আল ইমরান, আয়াত: ১৯২)।

দ্বীন (ধর্ম/সৎপন্থা) শিক্ষণের গুরুত্ব

মুনিরুল ইসলাম বিন মহবুল হক

এখনকার চ্যাংরা-পিল্যাকে দেখ্খ্যা হাঁর মুনে হৈল যে, ছ্যালা-পিল্যাকে কী কৈরা মানুষ করত্যে হৈবে ওগ্ল্যা কিছু লেখি। ছ্যালা-পিল্যাকে ভালো কৈরা মানুষ করা থাইক্যা শেরশাবাদিয়া মুসলমানরা খুব্বি কমজোর।

প্রত্যেক ধর্ম টিক্যা থাকে কালচার বা সংস্কৃতির মৈধ্য দিয়্যা। ইহুদি, খ্রীষ্টান, হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ – সবায় আপন আপন কালচার বাড়াইব্যার কোশিশ করে। সব ধর্মেই কিছু মানুষ গোঁড়া থাকে, ফের উদারও থাকে। কেহু নামে মাত্র ধার্মিক, ভিতরে কপট বা মোনাফেক। আর থাকল্যেও নামের থাকে, কামের লয়! ইসলাম যুক্তিবাদি কুসংস্কারমুক্ত একটি আধুনিক ধর্‌ম। এ্যার ভিতরিও কেহু ইমানদার, কেহু নামে মাত্র মুমিন। ধর্মীয় সংস্কৃতি ঠিক করার লাইগ্যা কহছি, মা-বাপ যেনে নিজেরঘে ছ্যালা-পিল্যার দ্যায়িত্ব ভালো কৈরা ল্যায়। তাইল্যে সব্বারি লাভ, গোটা সমাজের লাভ। মুসলমান বাপ-মা যুতি ভালো কৈরা দ্যায়ত্বটা না ল্যায়, তাইল্যে ফ্যামিলির সব্বারি ক্ষতি। তাল্লাগ্যা আল্লাহ-পাক "মাল-ধন আর ছ্যালা-পিল্যা"কে দুনিয়্যায় জিন্দেগির সুন্দর্য কৈহ্যাছেন (সুরা কাহাফ: আয়াত ৪৬)।

আল্লাহ-পাক আরো কৈহ্যাছেন, "মানুষের কাছে শোভাময় করা হয়্যাছে মাইয়্যালোক, ব্যাটাবেটি, জমা-রাখা সোনা ও রুপা, চিন্‌হারি-দেওয়া ঘোড়ারা, ঘরে-পোষা পশু, আর ফসলের খেত-খামার; এগল্যা এ দুনিয়ার ভোগের জিনিস, কিন্তু আল্লাহর কাছে রহ্যাছে সব চাইহ্‌তে বেশি আরামের মহল" (আল-কুরআন, সুরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৪)।

ইসলাম ছ্যালা-পিল্যাকে ভালো কৈরা শিক্ষা দ্যাওয়ার কথা খুব্বি জোর দিয়্যা কৈহ্যাছে। আল্লাহ-পাক বাপ-মা কে ছ্যালা-পিল্যার দ্যায়ত্ব মনে কৈরা দিয়্যা কৈহ্যাছেন: "হে ইমানওয়ালারা! তোমরা তোমারঘে পরিবারকে আগুন (দোজখ) থাইক্যা বাঁচাও!" (সুরা তাহরিম, আয়াত: ৬)।

ছ্যালা-পিল্যাকে ভালো শিক্ষা দ্যাওয়া বাপ-মার এ্যাকটা ফরজ কাম। ছ্যালা-পিল্যাকে মানুষ করার ওপর খুব্বি জোর দিয়্যাছেন মুহাম্মাদ (সা.)। তিনি কৈহ্যাছেন: "এ্যাকটা ব্যাটার ওর বাপের কাছে সব চায়্যা বড় পাওনা হৈল ওর বাপ যেনে ওকে দ্বীন (সৎপন্থা/সত্যধর্ম) শিক্ষা দ্যায়" (ইবনে মাযা)।

সব শ্যাষে হামরা আল্লাহর কাছে দুয়া করব, আল্লাহ যেনে হারঘে ছ্যালা-পিল্যাকে ভালো কৈরা মানুষ করার তৌফিক দ্যায় (আমীন)।

আরমান

মুহাঃ আব্দুল ওয়াহাব

(প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক,
হাজী নাকু মহম্মদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাজোল, মালদহ)

তেলিপাড়ার ঐ জামালুদ্দিন খুব খুশি হৈয়্যা অর বড় ভাই মহাসিনের পোর্থম ছ্যাইল্যাটাকে ঐদিন ভানির কোল থ্যাইক্যা লিয়্যা লিজের আঁটকুড়্যা বহুর বুকে তুইল্যা দিয়্যাছিল অ্যাইজ থ্যাইক্যা চাল্লিশ বচ্ছর আগে। পারাকরমের পেরাইমারিতে পাঁচ বচ্ছর পড়্হিয়্যা ভাগওয়ানপুরে সাত কেলাস পাস করাইয়্যা এখোন আবু শামার চাচা অকে কৈলকাতায় ভর্তি করতে চাহে।

এইট কেলাসের বাদে মাদ্রাসায় রেকর্ড নাম্বার পাওয়া ছাত্র আবু শামাকে ডাকতোরি পড়্যাবার লাইগ্যা সাইন্সের স্কুলে ভরতি করতে চ্যাহাছিল অর চাচা। হেটমাস্টারকে কত ব্যাগাত্তা কৈরা হাতে পাঁয়ে ধৈরা ছিল টি.সি.র ল্যাইগ্যা, কিন্তু ঐটা আর অকে দ্যাওয়া হয়নি। ব্যাচারা জামালুদ্দিন সেদিন লাচার হৈয়্যা বাড়তে ফিরা্যাছিল। কৈলকাতার কলেজেই আবু শামাকে আর্টস লিয়্যাই পড়তে হৈল।

বাড়ির কাছেই সামসি কলেজ! মনে মনে জামালুদ্দিন ভাবে --- বড় ভাইয়ের ছ্যাইল্যাটা যুদি এই কলেজে প্রিন্সিপ্যাল বা পোর্ফেসারই হইতে পারে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। লিজের বাড়িতে খ্যায়্যা সাইকেলে চৈড়্যা কলেজে চাকরিটা করতে পারবে।

ভাতিজার তোগ্দীরে ডাক্তারি হৈলোনা, পোর্ফেসারি হৈলোনা। কৈলকাতায় বেলে ভাল নাম্বার উঠে না। শ্যাষে ইস্কুলের মাস্টার হৈয়্যাই জীবনটা কাটছে অর ভাতিজার ।

ম্যালা দিন পর! জামালুদ্দিনের হাতে এখন লাঠি । চোখেও কম দ্যাখে। গাঁয়ের ঐ আনসুর ছোঁড়া একদিন মহ্জিদের কাছে অ্যাইস্যা অর ঘাড়ে হাত দিয়্যা কহিছে---দাদু, তুমি কি শুইন্যাছো, সামসি হাস্পাতালের স্যান্ডেল ডাক্তারের মাথা আর নাক-মুখ ফাটিয়্যা দিয়্যাছে হিলসামারির লোকেরা। অর্ঘে গাঁয়ের একটা বহুর ডেলিভারির সময় বহুটা মারা যায়। এমন খবর শুইন্যা জামালুদ্দিন হাতের লাঠিটা শক্ত কৈরা ধৈরা চোখদুটা বন্দো কৈরা কৈহ্যা উঠলো:

> হাঁবে অ্যানসা, ডাক্তার কি বহুটাকে হাতে ধৈরা ম্যাইরা ফেইলেছে, অর দোষটা কুনঠে আছে? আরে পোতা, তুই কি এইট্যা ঘটনা জানিস? আবে সামসি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ঐ কী নামটা যেনে, সুনীল বেঙাচীকে নাকি কলেজের ছ্যালারা আর মাস্টারেরা মিল্যা বেদম পিটালছে? কৈলকাতার বুড়া একজন মাস্টারের গায়ে কী কৈরা হাত তুললো কহাতো! ...

জামালুদ্দিন এখন শ্যাষকালে অ্যাইসা পড়্যাছে। ভাতিজাকে ডাক্তার আর পোর্ফেসার করার আরমান অর কবে খতম হইয়্যা গেছে। মাস্টার ভাতিজার জীবন সুখ-শান্তিতে কাটুক ---আল্লার দরবারে অর এখন এক্খিটাই ইচ্ছা ! নিজে কবরে যাওয়ার আগে ভাতিজাকে লিয়্যা মনের সব আরমান ম্যালা আগেই দাফন কৈরা দিয়্যাছে ।

ভাঙন

মহঃ মেহেদী হোসেন

গঙ্গার ভাঙ্গনে ক-একবার গাঁ-টা ভাইঙ্যা যাওয়ার বাদে নতুন কৈর‍্যা বৈস্যাছে। তাও গঙ্গার ঢেউয়ের আওয়াজ শুনতে পায় রাইতে গাঁ-বাসী। আওয়াজ শুনতে পায় ঘুমের মৈধ্যে। স্বপনের মৈধ্যে। বুড়াতি কালে জহক আলি আর অর স্ত্রীর বুকের তলের মাটি খসিয়্যা লিচ্ছে ঘরের কাজিয়্যা। যেম্নি গঙ্গার চোরা সোঁত তলে তলে পাটালের নীচের মাটি জুদা করে।

জহক আলির আইগ্যাতে বৈস্যা অর বড় বহুকে মানিক মড়ল কৈহলেন, "রোজ রোজ হামি তোরঘে বিচ্যার করতে পারবনা। অ্যাইজক্যাই একটা হ্যাস্ত-ন্যাস্ত কৈরাই ছাড়ব। তোরঘে শাশড়ি-বহূর নাটক আর ভাললাগেনা। শালা মড়ল হয়্যাই লাগছে জ্বালায় পইড়্যা গেছি। হাঁগে বড়ো বহূটা, কী তোর নাম ভুইল্যা যাছি, কীসের ল্যাইগ্যা তোর শাশড়ির সোঁতে ঝগড়া কইরাছিস, কহাতো।" বড় বহুটার নাম মনে করিয়্যা দিল মড়লর সাথী সামনুর।

বড় বহু তো একবারে দগদগ্যা ছাই-এর ফুণকি হয়্যা আছে। মড়লের কথার জবাব তখনি দ্যায়, "হামাকে কী কহিছ, আগে অকে শোধাও। বুড়ি হয়্যা গেছে তাও বহু-জ্বালানী খাসলতটা কেনে যাইন্যা! একবারে হাড়-মাঁস জ্বালিয়্যা খ্যাইছে।"

"হ্যাঁ তো কী ঘৈট্যাছে গে ভানী, আগে তুই কহা।"

"কী কহবরে ভ্যাই, তোমরা তো মড়ল মানুষ, সবিতো জানো। হামার যত জ্বালা এই পোতারাকে লিয়্যা। বড়ো পোতাটা চিল্ল্যা চিল্ল্যা কাঁনছেরে ভ্যাই। তো হামি খালি কহ্যাছি যে, কী হলরে কাঁনছিস কেনে? ম্যাইলে না কী রে? আর শুরু হয়্যা গ্যালো হামার ওপরে ঝড় বহিতে! একবারে খ্যাড় দিতে কুটা হয়্যা য্যাইছে। হামি বেলে জ্বালিয়্যা পুড়িয়্যা খাছি, বড় ব্যাটাকে তাবে কৈরা লেছি, ব্যাটারাকে বেলে সব কথা লাগিয়্যা দিছি, কতনা শুন্যাইলে হামাকে। সহিতে না প্যাইরা হামিও দুটা কথা কহ্যা দেছি রে ভ্যাই। অতি হাঁর দোষ হোইক তাও আর ঘ্যাঁইট হোইক তাও।"

"হ্যাঁ, খালি হামারি মুখ চৈল্যাছে আর হামার সোনা শ্বাশড়ি খালি লক্কেরা শুইন্যা ছিল, কিচ্ছু তো কহেনি, ওরে হামার দুলালী শ্বাশড়ি রে! কত যে শুইন্যা থাকনাবালা!!! দেইখ্যা লাগছে গাঁয়ের লোক জানে না! হামি হাঁর ছ্যাইলা কে মারি চ্যাহ্যা কাটি, তাতে তোমার কী? তোমার খাই না দাই? তুমি কহনাবালা কে? কৈ তুমি তো লুকিয়্যা লুকিয়্যা রোজ ভালো-মন্দ খাইছো, কুনু দিন তো দিল্যান্যা!"

“ছিঃ! জ্যাইত মারানী কথাগ্যালা কহিসন্যা! হামি কুনদিন পোতারাকে না দিয়্যা কিছু খ্যায়্যাছি? তোর মায়ের কিরা খ্যায়্যা কহাতো। চ্যারানার বিস্কুটওতো কুনদিন ছ্যাইড়্যা খ্যাই ন্যা। এদ্দে, এইগল্যা ঝুট্‌ঠা কথা কহার ল্যাইগ্যা রে ভ্যাই হামার সঁতে ঝগড়া হয়। এখন হামার ব্যাটা দশ টাকা ইনকাম করছে, তার ল্যাইগ্যা বহুর চোখ ফ্যাইট্যা গেছে। ব্যাটার কামাই খ্যাইতে দিবেনা, তাল্লাইগ্যা এইগল্যা করছে। জুদ্দা হওয়ার এইগল্যা বাহানা দেখ্যাইছে। সঁতে থাকলে যে মোঁথলা বাঁনতে প্যাইবেনা!”

জহক আলি এতক্ষণে মুখ খুললেন। সরাসরি মড়লকে কৈহলেন, “এ মড়ল, হামার বড় বহুকে জুদ্দা কইরা দে। হামার সামনে তোর ভানিকে কত রকম কৈরা কহিছে! একটু লইজ্জ্যা শরমও করেনা । দেইখ্যা লাগছে হামি মইরা গেছি! হামাকেও মাঝে মৈদ্ধে বুড়া, ঢাবসা মীনস্যা, মরবিন্যা কত রকম কৈরা কহ্যা দ্যায়! অরা আলাদা হৈয়্যাই যুতি সুখে খায় তো খ্যাইক! এ বয়সে আর কত্ত সহবো!! হামারঘে বুঢ়া-বুড়ির কপালে যা আছে হৈবে।”

মড়ল দুপক্ষকেই বুঝানোর কোশিস করেন। কিন্তু কোনো ফল হয়না।

“হ্যাঁ হামাকে জুদ্দা কৈরা দ্যাও! হামি আর তোমারঘে দাম্মা টানতে পারবনা,” বড় বহু ঝাঁঝি মাইরা একথা কৈহ্যা উঠে।

মড়ল ফের বুঝানোর চেষ্টা করেন, “হাঁগে বহু! তোর স্বামী তো বাড়িতে নাই, কেন্নি কৈরা জুদ্দা হবি? আর কিছু দিন সহ্যা বহ্যা চল।”

কিন্তু বড়বহূ কিছুতিই শ্বাশড়ির সোথে চলতে পারবেনা – একথা সাফ কৈরা জানিয়্যা দেয়। শেষমেষ মড়ল বড়ো বহুর স্বামীকে ফোন করলেন। অতেও কুনো ফল হৈলনা। আগে থেকে শুরু হওয়া ফাটল বড়ো হয়্যা গেছে।

মড়ল ভন্নিসাঞ্জে নিজের বাড়ির দিগে চৈল্যা যায়। দূরে শুনতে পায় শিয়ালের আওয়াজ। শুনতে পায় গঙ্গার সোঁতের আওয়াজ। জহক আলি আর অর স্ত্রী শুনতে পায় হাওয়ায় উঠা ঝড়-তুফানের সোঁ সোঁ আওয়াজ। শুনতে পায় লদ্দীর বড় বড় ঢেউ বাড়ির পুস্তাতে আইছড়্যা পড়ছে। চাভাং চাভাং করছে। আল্লাহ, তুমিই মালিক। লিঃশ্বাস ফ্যালে জহক আলি।

সাধ

মাসুদ আলাম

এই গে রহিমের মা, রহিমের বাপ কুন্ঠে গেছে?

উ তো হাল চষতে গেছে ভোরবেলা উইঠ্যা, বাসি প্যাটে। মাথায় পাগড়ি বাইন্ধ্যা যখন বাহির হইল বাড়ি হ'নে, মোড়লেরঘে ভুইঁ চষবে বৈল্যা, রহিম তখন ঘুময়া ছিলো । উ হামাকে কৈহলো:

দ্যাখগে রহিমের মা, হামার কথা শুন, ঘুম থাইক্যা উঠলে শুধাবি অকে, অকে কহবি ইস্কুলে যাইতে। উ পড়াশুনা কোরবে, শিক্ষতি হৈবে।এ হামার বড় আরমান।

হামার প্যাটে বিদ্যা ন্যায়। আর অরা ভাবে হাঁর বুদ্ধি নাই।হামি মুরুক্‌খো। কিন্তু, কিন্তু জানিস রহিমের মা, অরা যখন হাঁকে মুরুক্‌খো কহে, তখন, তখন হাঁর দেলটা যেনে ফাইট্যা যায়, তখন মনে খুব গোঁসা হয়।আর জানিস, জানিস রহিমের মা, ভাবতে থাকি যুদি হাঁর বাপ শিক্ষতি হৈতক, যুদি হাঁর বাপের টাকাপয়সা থাকতক, হামি ইস্কুলে পৈড়্যা শিক্ষতি হইতুঙ, মাস্টর হৈতুঙ তখন। তখন কি অরা হাঁকে রহিমের বাপ কোহিতক, মুরুক্‌খো কোহিতক? অরা কৈহতক, "করিমসাহেব" আরো কত কি।

বুইঝলি রোহিমের মা, এ হামার বড় স্বপন ছিল, বড় সাধ ছিল। তো হামি শিক্ষতি মাস্টর হইনুনা বটে, মোড়লেরঘে হাল চৈষ্যা হামার রহিমকে শিক্ষতি করবো, অকে মাস্টর করবো, আর উ মাস্টর হৈলে হামাকে অরা কি নামে ড্যাইকবে জানিস, জানিস রহিমের মা।অরা ড্যাকবে, দ্যাখ, আরে দ্যাখ, দ্যাখ ঐ যে যায় রোহিমবাবুর আব্বা। তখন, তখন, ভাব রহিমের মা, ভাব, ভাইব্যা দ্যাখ, হামার বুকটা ফাইল্যা উঠবে, ফাঁইপ্যা উঠবে দশ হাত।

বাছি চারাইতে যাইয়া

(সুজাপুরী ভাষায়)

মোঃ আলিউল হক

তখন হামি ছোট্ট আহান্নু; স্কুলনে আইসা আকলা এ্যকদিন হামাঘেরে বাছিটাকে লিয়া চারাইতে যাইছুনু পাতালচাণ্ডী। বাগানের মৈদ্ধ্যে গরুটাকে লিয়া আকলাই হাঁটছি। চাইরোদিকে খালি আইসন্যা আমের গাছ। মোট্টা মোট্টা ডালগালা কুনটা ফের খুভি নিচ্চা। খ্যায়াল নাহি রোইহ্লে মাথাতে এমন লাগবে যে মাথাকে ফাটিয়্যাই দিবে। ওগনেই হামি বাছিটাকে লিয়া আকনা সাবধানেই যাইছুনু। গোরুটার কিন্তু কুনু দোঘা আহাললো না। ছুট্টাই হাঁটছোলো হামার আগে আগে।

হঠাৎ হামি দেখছি এ্যকটা মোট্টা তাগড়া আঁড়িয়া হামার বাছিটার পিছে পিছে হানহানিয়া চইলা আসসে। হামি তখন ভয় পাইয়া য্যানকি বুদ্ধিহারা হৈয়া গেনু। আর বাছিটাও য্যানকি ঢিল ছাইড়া দেহলো। হাঁটতে চাহাইছোলোনা। কি যে করি আনর-পানরেও কেহুঁ নাইখো। ডরে ভয়েই দায়ে পৈড়া এ্যকটা মিহি লাঠি লিয়া আঁড়িয়াটাকে দূরনেই মারার চেষ্টা করি। কিন্তু ওগলা লাঠি অর কাহে কিচ্ছুই নাহি। বেয়াড়া হইয়া আরও মাথাটাকে লাড়াই। হামার আরও ডর ধইরা যায়।

কিযে করি হামার গরুটা যেদিকে যায় বাজ্জাত আঁড়িয়াটাও ওইদিকেই ফুরতি কইরা পিছে পিছে হাঁটে। কামন কইরা হামাঘেরে পাত্তার ভূঁইয়ে যাবো এরকম ল্যাঠা হইলে। মনে মনে ভাবতেই কাছেই দেখনু একখিটা আম গাছের ধড়ে একখিটা খুভি লাম্বা মোট্টা ডাল সেটা খুব নিচ্চা। মনে হইলো এপাকে নিচ্চা ডালের তল দিয়া হামার গরুটা গেলে আঁড়িয়া ব্যাটা আঁটকিয়া যাইবে। আর সেটাই হইলো। হামার বাছিটার কি মতলব হইলো নিচ্চা ডালটার নিচ দিয়া যেদিকে যাইছুনু ওই দিকেই হাঁইটা চোলাইলো। হামি তখন ফুর্তি কৈরা কাদা-পানির মৈদ্ধ্যেই বাছিটাকে হাঁকিয়া লিয়া চলনু পাতালচাণ্ডীর দিকে । বাজ্জাত আঁড়িয়াটা আর আগিয়া আসতে পারলোনা। নিচ্চা ডালে আঁটকিয়া রইহালো।

এরকম কৈরা ফাঁড়া কাইটা যাওয়ার গুনে হামি ওই দিন হাঁপ ছাইড়া বাঁচি।

শেরশাবাদিয়া ভাষায় গীদ, গান ও আলকাপ

গানে গানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অনুযোগ
(সুর: প্রচলিত)

মুহম্মদ সাজিরুদ্দিন

স্বামী:

ওরে, কী জুঞ্জাল হামি লিয়্যা আইনু রে!
বেলতুলির ঘাটে কী লাইগ্যা যে হৈলো দ্যাখা
হৈনু খ্যাপা বিহ্যা করার লাইগ্যা...

ওরে, ড্যাড় বিঘ্যা ভুঁই বেচ্যা দিয়্যা
কিন্যা দিনু হাঁর বিছ্যা রে;
কী জুঞ্জাল হামি লিয়্যা আইনুরে...

তাতা ভাত খাইবের ল্যাগ্যা করনু অকে বিহ্যা,
বাসি ভাত খাইতে খাইতে জীখ্যান গ্যালো অ্যাইলিয়্যারে,
কী জুঞ্জাল হামি লিয়্যা আইনুরে...

হাসি মুক্ দেকভো কোহ্যা পলা দিনু হাতে,
তাও চোপা ভারি দেখ্যা কান্দছি দিনে রাইতে রে;
কী জুঞ্জাল হামি লিয়্যা আইনুরে...

জী চাহিলে খ্যাইতে আইজক্যা মাছ গুঁচি ট্যাংরা,
মাছ দেখ্যা লাফাইছে চিল্ল্যা যেনে হোয়্যাছে ল্যাংড়া রে,
কী জুঞ্জাল হামি লিয়্যা আইনুরে...

হাড়-মাঁস হৈলো কালি শুখিয়্যা গ্যালো মুক্,
হাড়ে হাড়ে বুঝ্যা লিনু পেরেম করার সুখ রে;
কী জুঞ্জাল হামি লিয়্যা আইনুরে।

স্ত্রী:

ঝুঠ্‌ঠা মরদ তুই হনুমান
বেলৈজ্যা নাই তোর সমান;
ভোগা কথায় করলি হাঁকে বিহ্যা রে,
ভুলিয়্যা লিলি কুন্‌ যে গাছ্‌ খিলিয়্যা...

হামাকে যে কোহ্যাছিলি তুই
হালের ভুইষ চ্যার জোড়া,
দুধাল গায় ল জোড়া
বকরী ভেঁড়ীর সীব্যা সৈংখ্যা নাই,
বোহু হোয়্যা আইস্যা দেখি
সবই ভোগা আর ফাঁকি
ভুঁই বাহিস কিন্যা হাল দিয়্যা...

হামাকে যে কোহ্যাছিলি তুই
ছাপ্পেরখাট আছে ছ খান
তোষক ক্যাঁথা পুন্দরো খান
লেহেলি বালিসের সীব্যা সৈংখ্যা নাই---
ঘরে আইস্যা আইজ দেখি
সবই ছিলো তোর ফাঁকিবাজি
শুতি মাথায় কাঁড়ির বালিশ দিয়্যা...

হামাকে যে কোহ্যাছিলি তুই
কাঁসার থালি আছে বারোখান,
লোটা খোরা গোটা দশখান
বধনা গিল্যাসের সীব্যা সৈংখ্যা নাই,
ঘরে আইস্যা দেখি হায়!
সিলবোরের থালি খালি গড়্গড়াই
পানি খাই বধনার লোল দিয়্যা...

কত কী যে কৈহ্যাছিলি তুই!
পুরাণা কাপড় পিন্‌হি ন্যা হাঁরা
ছাপা শাড়ী আছে বাস্ক ভরা
তহামুন ধুত্তির সীব্যা সৈংখ্যা নাই,
বিহ্যা কৈরা করি হায় হায়
চোখের পানি ঝৈরা যে যায়
শরীল ঢাঁকি ছিঁড়্যা তেনা দিয়্যা...
মৈরা যাবো গলাতে ফাঁস দিয়্যা...

স্বামী-স্ত্রীর রাগ-অনুরাগ

মোঃ কাওসার আলী

স্বামী: তুই রে হামার জোষ্টি মাসের কাঁচামিঠি আম
কাঁচাও মিঠ্যা পাকাও মিঠ্যা লোকে করে নাম ---
তেমনি তোকে ভালোবাসি করিসন্যা অভিমান
রে সখী, করিসন্যা অভিমান।

স্ত্রী: কেমন তুমি মরদ মানুষ সংসারে নাই মন
টো টো কইরা ঘুইরা বেড়াও বেড়াও সারাক্ষণ
একা একা ঘরে হামি থাকি যে কেমন
ওগো তুমি বুঝনা হাঁর মন।

স্বামী: দ্যাশে নাকি আস্যাছে এক ভাইরাস করোনা
চাকরি গেছে বন্ধ হয়্যা বেতনও দ্যায়ন্যা ----
কাজের খোঁজে ঘুরি হামি, রাগ করিসন্যা রে
সখী ভুল বুঝিসন্যা।

স্ত্রী: গত মাসে চাহ্যাছুনু লতুন এ্যাখান শাড়ি
লয়্যা শাড়ি ছাড়া যাবো ক্যামনে বাপের বাড়ি ---
দুঃখে মরি! হামি যে এক কপাল পুড়া নারী
ওরে কষ্ট হামার ভারী!

স্বামী: দ্যাশটা আবার ঠিক হইবে য্যাবে করোনা
চাকরি হইবে টাকা হইবে দুঃখ রবেনা
মাসে মাসে তখন তোকে কিনা দিবো শাড়ি
তুই রে হামার বুকের ভিতর গান গাহা শুক-সারি
সহি রাগ করিসনা ভারী।

স্ত্রী: ঝালে গুড়ে মিল্যা য্যামন বানায় ঝালের পিঠ্যা
নামে ঝাল হলেও সখা লাগে বেজায় মিঠ্যা
তেমনি তুমি মিঠ্যা বন্ধু আমার মাথার ফুল
সখা হইবেনা আর ভুল।

প্রচলিত শেরশাবাদিয়া গীদ সংগ্রহ

১. চন্দ্রপুর, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ হতে চাঁই সমাজের মহিলাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন **কবি মোহন মণ্ডল** ।

মা গে মা বহুকে দেখ্যা ধন্দক ল্যাগ্যাছে

বহুর এই পিঠ-খান
(যেনে) কাপড় খিঁচার পিড়হ্যা-খান,
মা গে মা বহুকে দেখ্যা ধন্দক ল্যাগ্যাছে।

বহুর এই চোখ-খান
(যেনে) আমড়ার আঁঠি-খান,
মা গে মা বহুকে দেখ্যা ধন্দক ল্যাগ্যাছে।

বহুর এই হাত-খান
(যেনে) বকরী ঠুকার খুঁটা-খান,
মা গে মা বহুকে দেখ্যা ধন্দক ল্যাগ্যাছে।

বহুর এই পা-খান
(যেনে) ভুঁইষ বান্ধার খুঁটা-খান,
মা গে মা বহুকে দেখ্যা ধন্দক ল্যাগ্যাছে।

২. বিয়ের ভোজের জন্য ধান বাহানার সময় ঢিঁকিতে পাহার দিতে দিতে মহিলাদের গীদ

সংগ্রহ: মুহম্মদ সাজিরুদ্দিন, মঙ্গলবাড়ী, মালদহ
সৌজন্য: আখতার জাহান সন্ধ্যা, স্বামী- মহঃ মইনুল ইসলাম, রশিলাদহ, মালদহ

মালদা জেলার হিমানি পাউডার কেবা আইন্যাছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাইছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

মালদা জেলার হিমানি পাউডার লিটন আইন্যাছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাইছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

পাউডার নাকিন আইন্যা লিটন ঘরে সান্‌হ্যাইছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

ঘরে নাকিন সান্‌হিয়্যা লিটন রুবিকে ডাইক্যাছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

ঘরে নাকিন সান্‌হিয়্যা রুবি পাউডার মাইখ্যাছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

পাউডার নাকিন মাইখ্যা রুবি বাহিরে বার্হায়ছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

বাহিরে নাকিন বার্হিয়্যা রুবি ধান ল্যাড়াইছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

ধানও নাকি লাড়িতে রুবির মুখও ঘ্যামাইছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

রুমাল নাকি দিয়্যা লিটন রুবির মুখও মুছালছে
জলে ম্যাসিন জুইড়্যাছে, জলে ম্যাসিং জুড়াইছে।

৩. থুবড়া খাওয়ানোর (বিয়ের আগে হবু বর বা হবু কনের মুখে মিষ্টান্ন তুলে দেয়ার) সময় মহিলাদের গীদ

সংগ্রহ: মুহম্মদ সাজিরুদ্দিন, মঙ্গলবাড়ী, মালদহ
সৌজন্য: আখতার জাহান সন্ধ্যা, স্বামী মহঃ মইনুল ইসলাম, রশিলাদহ, মালদহ

আতব চাইলের লিল্ল্যা দুধের ক্ষিরস্যা রান্‌হায়নু হে
ক্ষিরস্যা খাইতে গরমি লাগে, ই কুনুবি বিচারও হে

কাঁহা গেলে আরসের বাবা, বিয়ানি ডোলায়ও হে
আতব চাইলের লিল্ল্যা দুধের ক্ষিরস্যা রান্‌হায়নু হে

বড়ো বড়ো বিয়্যানিগালা পাঙ্খ্যা ডোলায়ও হে
আতব চাইলের লিল্ল্যা দুধের ক্ষিরস্যা রান্‌হায়নু হে

ছোটো ছোটো বিয়্যানিগালা ঝারল লাগায়ও হে
আতব চাইলের লিল্ল্যা দুধের ক্ষিরস্যা রান্‌হায়নু হে

৪. বিয়ের প্রস্তুতি পর্বে মহিলাদের গীদ

সংগ্রহ ও কথা পরিমার্জনা: মুহম্মদ সাজিরুদ্দিন, মঙ্গলবাড়ী, মালদহ

তেল ও হলোদ মাইখ্যা লাসা রে
বাজারে বার্হ্যায়লো, আরে ঐ...

বাজারে বার্হ্যায়লো...

বাজারে বার্হিয়্যা লাসা রে
বাইছ্যা কিনে টিকলও, আরে ঐ...
বাইছ্যা কিনে টিকলি...

সে না টিকলি লিয়্যা লাসারে
যায় ছাইল্যা আরোসের কাছে, আরে ঐ
ছাইল্যা আরোসের ঘরে...

টিকলি হাতে লিয়্যা লাসা রে
লাগায় আরোসের কপালে, আরে ঐ...
ছাইল্যা আরোসের কপালে...

শহারে যায়্যা লাসা রে
করে ঘুরি ফিরি, আরে ঐ...
করে ঘুরি ফিরি...

ঘুরিতে ফিরিতে লাসা রে
কিনে পোস্‌সিন শাড়ী, আরে ঐ...
কিনে রোঙ্গিল শাড়ী...

সে না শাড়ী লিয়্যা লাসারে
তুল্যা দ্যায় শ্বাশড়ীর হাতে, আরে ঐ...
দ্যায় শ্বাশড়ির হাতে...

বাজারে যায়্যা লাসা রে
কিনে ল'টা তাবিজ, আরে ঐ...
কিনে ল'টা তাবিজ...

সে না তাবিজ লিয়্যা লাসারে
পিন্‌হ্যায় আরোসের গলায়, আরে ঐ...
ছ্যাল্যা আরোসের গলায়...

বাজারে য্যায়্যা লাসারে
কিনে পোসিন জুত্তা, আরে...
কিনে পোসিন জুত্তা...

সে না জুত্তা লিয়্যা লাসা রে
দ্যায় পিন্‌হিয়্যা আরোসের পায়ে, আরে ঐ
ছ্যাল্যা আরোসের পায়ে...

মিঠাইয়ের দোকানে য্যায়্য লাসা রে
কিনে দুই কাতারি গোল্লা, আরে ঐ...
কিনে মোতিচুরের লাড়ু...

সে না লাড়ু হাতে লিয়্যা রে
তুইল্যা দ্যায় আরোসের মুখে, আরে ঐ...
ছাইল্যা আরোসের মুখে...

৫. বিয়ের প্রস্তুতি পর্বে মহিলাদের গীদ

সংগ্রহ: মুহম্মদ সাজিরুদ্দিন, মঙ্গলবাড়ী, মালদহ
সৌজন্য: পরিবানু, স্বামী আবদুল লতিফ, মৌলপুর, মালদহ

খিলি কদমের তলে রে ডোমোনা, বাজাও রসের বাঁশি,
হামার ডোমোনা রে...

খিলি কদমের তলেরে ডোমোনা, বাজাও হাউসের বাঁশি
হামার ডোমোনা রে...

তোর হিপ্পির চটকে রে ডোমোনা, ভুল কৈরা আইনু
হামার ডোমোনা রে...

লিয়্যা য্যায়্যা খিলাবিরে ডোমোনা, সামা-কোদার ভাতও
হামার ডোমোনা রে...

হামার বাপের আছে রে ডোমোনা, বাঁশফুল ধানের ভাতও
হামার ডোমোনা রে...

লিয়্যা য্যায়্য বসাবি রে ডোমোনা, ভাঙ্গা চুরা চেয়ারে
হামার ডোমোনা রে...

তোর ফ্যাসান দেইখ্যা রে ডোমোনা, পাছা ধৈরা আইনু
হামার ডোমোনা রে...

লিয়্যা যায়্যা বসাবি রে ডোমোনা, তাল-কুঁড়ার ঘরে
হামার ডোমোনা রে...

লিয়্যা য্যায়্যা পিন্ধাবি রে ডোমোনা লারা ডোরার ত্যানা
হামার ডোমোনা রে...

লিয়্যা য্যায়্যা শুতাবি রে ডোমোনা ছিঁড়্যা ছুট্রা চটে
হামার ডোমোনা রে...

৬. মহিলাদের বিয়ের গীদ

সংগ্রহ ও পরিমার্জন: মুহম্মদ সাজিরুদ্দিন, মঙ্গলবাড়ী, মালদহ

আরোসের মার ঘরে সাঞ্ঝাবো
আরোসের মাকে লাছ্যাবো
সাঞ্ঝের বেলা হামরা আরোস লিয়্যা যাবো না রে...

বাসর ঘরে সাঞ্ঝাবো
আর আরোসের মাকে কান্দাবো
সাঞ্ঝ-রাইতে হামরা আরোস লিয়্যা যাবো না রে...

আরোসের বাপের ঘরে সাঞ্ঝাবো
কুঁছা পাইত্যা টাকা চাহাবো
মাঞ্ঝ রাইতে হামরা আরোস লিয়্যা যাবো না রে...

আরোসের দাদীকে ডাকবো
থুঢ়থুঢ়্যা বুঢ়ীকে লাছ্যাবো
ঢের রাইতে হামরা আরোসকে হল্‌দি মাখাবো রে...

আরোসের নানীর ঘরে ঢুকবো
আরোসের নানীকে লাছ্যাবো
নিশি-রাইতে হামরা আরোস লিয়্যা যাবো না রে...

আরোসের ননদের ঘরে সাঞ্ঝাবো
আরোসের ননদকে হাসাবো
ভোর-রাইতে হাঁরা লাছোন অর
দেখভো না রে...

আরোসের বোহনুর গলায় গামছা লাগাবো
অকে টাইন্যা লাছ্যাবো
পোঁহাতে হাঁমরা আরোস লিয়্যা যাবো না রে...

গ্রন্থ-আলোচনা:

আমার আবিষ্কার মালদায় কিল্লা-ই-বিহার// আবদুস সামাদ

রত্না প্রকাশন, কোলকাতা-৭৫

মূল্য: ১২০/ টাকা

বর্তমান সাহিত্য-ইতিহাস জগতে আবদুস সামাদ একটি সুপরিচিত নাম। তিনি দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক এবং ৭০ খানির বেশি গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থখানি হলো *আমার আবিষ্কার মালদায় কিল্লা-ই-বিহার*। তিনি এ গ্রন্থখানিতে নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্তি-প্রমাণে মালদা জেলার রতুয়া-থানার অন্তর্গত 'বাহারাল' নামক স্থানাঞ্চলটিকে ঐ "কিল্লা-ই-বিহার" টির প্রকৃত অবস্থানরূপে নির্ণয়-আবিষ্কার করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি যথার্থতই ঐ "বাহারাল" স্থানাঞ্চলটিকে মূলত "বিহার-আল" কথাটির অপভ্রষ্ট রূপ-চেহারা স্বরূপে দেখিয়েছেন, তথা "বিহার-আল" কথাটিরই হুবহু পার্শী রূপান্তর স্বরূপে "কিল্লা-ই-বিহার" কথাটিকেও অত্যন্ত জোরালো যুক্ত-তথ্য দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ ও দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত এটি এক কথায় একটি মূল্যবান আকর গ্রন্থ এবং সমগ্র গৌড়বাংলার তথা বিশ্ববাংলার ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন।

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ

একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

স্বেচ্ছাসেবী /কর্মী /সদস্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ
দূরভাষ: ৯৪৩৪৪৫৬০৩৮
ইমেল: shershabadia.vikash.parishad@gmail.com

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদের পত্রিকা

শেরশাবাদের কাগচ

আগামী হেমন্ত সংখ্যা ২০২৭ (অক্টো.-নভে. ২০২০)-র জন্য লেখা পাঠান। বর্তমান কপি পেতে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ: ***গৌড়বঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা*** **কার্যালয়**
১৪৫/১০৮/১৯১(এ), পূর্ব হায়দারপুর (দাদামোড়)
পোষ্ট ও জেলা: মালদহ, পিন: ৭৩২১০১, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ: ৭০০১৫৬২১৬৮
ইমেল: shershabaderkagoch@gmail.com

শাখা অফিস:
“*শেকড়*” পত্রিকা কার্যালয়, প্রযত্নে: মহম্মদ আলামিন
“পাকীজা” (বেগম সাকীলা স্মৃতি ভবন)
গ্রাম: নবপল্লী, পোস্ট: কৃষ্ণপুর, থানা: লালগোলা, জেলা: মুর্শিদাবাদ
মোবাইল নং- ৯৮৫১৭৫৫৪৯৮

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ

(একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)

পরিষদের লক্ষ্য

**গঙ্গা-মহানন্দার দোয়াব অঞ্চলকে বুকে ধইর‍্যা,
রাঢ় অঞ্চলকে ডাহিন হাতে আর বরিন্দ অঞ্চলকে বাঁ হাতে আঁইকড়্যা ধইর‍্যা
বাঙলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের মিলন-মোহনায় রৈহ্যাছে 'শেরশাবাদ' পরগণা।
মূলগতভাবে এই ভুখণ্ডেরই ভূমিপুত্র হৈলো 'শেরশাবাদিয়া' জনজাতি।
বাঙলা-বিহার-ঝাড়খণ্ড ছাড়াও এই রাইজ্যগালার বাহিরেও
এই জনগোষ্ঠীর বিস্তার ও আবাদি রৈহ্যাছে।
এই সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন
তথা ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশই
এই পরিষদের আসল লক্ষ্য।**

অধ্যাপক ওয়ালিউল্লাহ
সম্পাদক

অধ্যাপক আবদুল অহাব
সভাপতি

শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ
দূরভাষ: ৯৪৩৪৪৫৬০৩৮
ইমেল: shershabadia.vikash.parishad@gmail.com

শেকশাবাদের কাগচ

জিলহজ্জ ১৪৪১- মুহর্রম ১৪৪২